February-March
2024

পশ্চিম বাংলায় মাসলাকে আলা হযরত এর মুখপত্র
ত্রৈমাসিক

সুন্নী দর্পণ পত্রিকা

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামাজ।
- রোজার মাসলা মাসায়েল।
- যাকাত ও ফিতরা সম্পর্কে খুঁটিনাটি মাসলা।
- রোজার মাস আত্ম সংযমের মাস।
- ফিলিস্তিন ইসরাইলি দ্বন্দ্ব।
- কালামে রাজার ব্যাখ্যা।

সম্পাদক
খলিফায়ে হুজুর জামালে মিল্লাত
মুফতী নুরুল আরেফিন রেজবী আজহারী।
পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ।

৭৮৬/৯২/৯১৭

পত্রিকার জন্য খাস দুয়া

পীরে ত্বরীকাত জামালে মিল্লাত হুযুর জামাল রেজা খান ক্বাদেরী রেজবী নুরী দামাত বারকাতাহু, বেরেলী শরীফ।

۷۸۶ / ۹۱۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بڑی مسرت کی بات ہے کہ عمر پور ضلع مرشد آباد سے مسلک اعلحضرت کی تبلیغ واشاعت کیلئے ایک سنی بنام (سنی درپن) عنقریب شایع ہونے جارہا ہے مجھے امید ہی نہی بلکہ یقین ہے اس بنگلہ رسالہ کی معرفت سنی بنگالی مسلمانوں کو خاطر خواں فیض ملے گا اللہ تعالیٰ سے دعاء ہے کہ اس رسالہ کو قبولیت عام نصیب فرمائے اور اس رسالہ کے ایڈیٹر وتمام اراکین ومعاونین کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے

ভাষান্তর

মুফতী মুহাম্মাদ সাফাউদ্দিন সাক্বাফী আল আশরাফী

বড় আনন্দের সংবাদ এই যে, মুর্শিদাবাদ জেলার উমরপুর হইতে মাসলাকে আলা হাযরাতের প্রচার ও প্রসারের জন্য খুব তাড়াতাড়ি সুন্নী দর্পণ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ হইতে চলিয়াছে। আমি শুধু আশা করিতেছিনা বরং দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি যে, এই বাংলা পত্রিকার মাধ্যমে বাঙ্গালী মুসলমানগণ যথেষ্টভাবে উপকৃত হইবে। আল্লাহর নিকটে দুয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, এই পত্রিকাকে যেন সর্ব সাধারণের কাছে উপযোগী করিয়াদেন এবং এই পত্রিকার সম্পাদক ও এই পত্রিকার সাথে জড়িত সমস্ত ব্যক্তিগণ এবং সাহায্যকারীগণকে দ্বীন ও দুনিয়ার নিয়ামতে মালামাল করে দেন। (আ-মী-ন)

হুযুরে সহি (প্রত্যায়িত কপি)

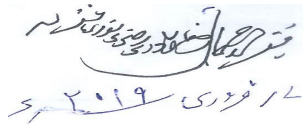

৭৮৬/৯২/৯১৭

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

≈ ত্রৈমাসিক

সুন্নী দর্পণ পত্রিকা ≈

শিক্ষা, ধর্ম, সাহিত্য বিষয়ক (ফেব্রুয়রী-মার্চ, ২০২৪)

(৫ম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা)

স্মরণার্থে

সিরাজুল উম্মাহ্ হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হযরত নুমান ইবনে সাবিত ইমামে আযাম আবু হানিফা রাদ্বিয়াল্লাহু।

বাফায়জে রুহানী

হুযুর গাওসে সামদানী কুতুবে রাব্বানী মাহবুবে সুবহানী শাইখ আব্দুল ক্বাদীর জিলানী ও গিলানী, হুযুর সুলতানুল হিন্দ খাযা গরীব নাওয়াজ, মাহবুবে ইয়াজদানী হুযুর মাখদুম আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী, মুজাদ্দিদে আযাম ইমাম আহমদ রেযা খান মুহাদ্দিসে বেরেলবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম।

পৃষ্ঠপোষক বা জেরে সারপারস্ত

পীরে ত্বরীকাত জামালে মিল্লাত হুযুর জামাল রেজা খান ক্বাদেরী রেজবী নুরী দামাত বারকাতাহু, বেরেলী শরীফ।

সম্পাদক ঃ খলিফায়ে হুযুর জামালে মিল্লাত **মুফতী নুরুল আরেফিন** রেজবী আজহারী (পূর্ব বর্ধমান)।
সহ-সম্পাদক ঃ আলহাজ্ব মাষ্টার শফিকুল ইসলাম রেজবী সাহেব। (শিক্ষক গাড়ীঘাট মাদ্রাসা)
সভাপতি ঃ মুফতী মুজাহেদুল ক্বাদেরী (মুর্শিদাবাদ)
সহ-সভাপতি ঃ মুফতী সাফাউদ্দিন আশরাফী সাক্বাফী। (পঃ বর্ধমান)
অক্ষর বিন্যাস ঃ মৌলানা খাইরুল হাসান আশরাফ,
কোষাধ্যক্ষ ঃ মৌলানা খাইরুল হাসান আশরাফ জামালী।

≈ সূচিপত্র ≈

১. সম্পাদকীয় (মুসলিম যূবকদের অধঃপতন থেকে রক্ষার কৌশল)---------- ৪
২. তাফসীর ও ব্যাখ্যা ---------- ৫
৩. হাদীস শরীফ দ্বারা আক্বাইদ শিক্ষা ---------- ৬
৪. রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র নামায হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিতে ---------- ৯
৫. মালিক ও মুখতার নাবী (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ---------- ১১
৬. যাকাত ও ফিতরা সম্পর্কে খুঁটিনাটি মাসলা ---------- ১৩
৭. ফিলিস্তিন ইজরায়েল দ্বন্দ্ব- একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ---------- ১৬
৮. মহিলা যখন একজন আদর্শ মা ---------- ১৮
৯. বিত্‌রের নামায হল তিন রাকায়াত ---------- ১৯
১০. ইসলামের বিধানসমূহ ঃ সংজ্ঞা ও হুকুম ---------- ২০
১১. ভারতীয় মুসলমানদের ৭৫ বছরের নির্যাতিত সফর ---------- ২১
১২. হেলাল সাব্যস্ত হওয়ার পদ্ধতি ---------- ২৩
১৩. রোযা সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসলা ---------- ২৭
১৪. সিলসিলায়ে আলিয়া ক্বাদেরীয়া বারকাতিয়া রেজবীয়া নুরীয়ার ৫ম শায়েখ ---------- ২৯
১৫. আমরা যাঁদের কে হারালাম ---------- ৩০
১৬. আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর নাত ও তার অর্থ ও ব্যখ্যা-- ৩৩
১৭. রমজান মাস আত্ম শোধনের মাস ---------- ৩৫
১৮. ফতওয়া বিভাগ ---------- ৩৭
১৯. হানাফী মাযহাবের বর্তমান রুপই হল মাসলাকে আলা হযরত ---------- ৩৮
২০. মানকাবাতে খাজা গরীব নওয়াজ ---------- ৩৯

بسم الله الرحمن الرحيم

সম্পাদকীয়

মুসলিম যুবকদের অধঃপতন থেকে রক্ষার কৌশল ঃ আমল ও তারবীয়াত

আমি একটি মিশন নিয়ে আলোচনায় বসেছি। যেটা হল মুসলিম যুব সম্প্রদায়দের অধঃপতন থেকে রক্ষা করার কৌশল। একথা অনস্বীকার্য যে, ইসলামী দাওয়াত, আমল ও তারবীয়াত ব্যতীত মুসলিম যুব সমাজ সু-গঠিত করা সম্ভব নয়। মুসলিম যুবকদের প্রথমে দ্বীনি ইসলামের উপর সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে; তাদেরকে মধ্যে আল্লাহর ভীতি ও পরহেযগারিতা শেখাতে হবে। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অমীয় আদেশ-নিষেধের উপর প্রবতীর্ত শরীয়তের আইনকে আঁকড়ে ধরার পাশাপাশি নামায, রোযা, দৃষ্টি অবনত রাখা, জিহ্বা হেফাজত করা, পাপ থেকে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হেফাজত করা শেখাতে হবে। তাদেরকে আত্মসম্মানবোধ, ভয় থেকে মুক্তি, বিশেষ করে জীবিকার ভয় থেকে মুক্তি, একনিষ্ঠ ইমানী চেতনার উপর গড়ে তুলতে হবে। কেননা, ঘাড় ও মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেয় যা, তা হচ্ছে জীবিকা-রোজগারের ভীতি। এটি এমনই এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে তার সমাধান সম্ভব নয়। জটিল অপচ্ছায়া মুসলিম যুবকদের সবসময়ে তাড়িয়ে বেড়ায়। সুতরাং ভয় থেকে মুক্তির বিকল্প নেই। জীবিকার ভয়, জীবনের ভয় ও রোজগারের ভয় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাদের প্রয়োজন সুন্দর তারবীয়াতের। আর যেটা একমাত্র কোন উত্তম ব্যক্তির সহচর্যেই সম্ভব। তাঁর দেওয়া তারবীয়াতের পরই মুসলিম যুবকেরা ইসলামী স্রোতধারা , ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে। সমাজে ইসলামী কৃষ্টির স্রোতধারা গতিময় হওয়ার ফলে ইসলামী উম্মাহর উন্নয়নে বিকাশ ঘটবে। মুসলিম যুবকদের সুন্দর তারবীয়াতের মাধ্যমে কুরআন, সুন্নাহ, তাওহীদ, আল্লাহ ও তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা, ত্যাগ-তিতিক্ষা ইত্যাদির শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে ; রিপুকে দমন করা, কু-প্রবৃত্তির উপর জয়ী হওয়া, নিজের পছন্দের ব্যক্তিত্ব ও নিজ দল বা গ্রুপের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা থেকে দূরে থাকা এবং যেখানে যেটা সতা সেখানে সেটা উচ্চারণ করা ইত্যাদি বিষয়ের উপর তারবীয়াত দিতে হবে। মুখ ও গোপানাঙ্গের কু-প্রবৃত্তি, বিশেষ করে মুখের কু-প্রবৃত্তি-যখন যা মুখে আসে তাই বলে ফেলা এবং যখন যা সামনে আসে তা-ই খেয়ে ফেলা, মোবাইল তথা সোশ্যাল মিডিয়ায় অশ্লীল দৃশ্য দেখা থেকে মুক্ত থাকা প্রশিক্ষণ দিতে হবে। কেননা, রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ কেউ যদি আমার পক্ষ থেকে তার মুখ ও লজ্জাস্থানের যিম্মাদার হয় (হেফাজত করে) আমি তার পক্ষ থেকে জান্নাতের যিম্মাদার হবো। (সহীহ বুখারী হাদিস নং ৬৪৭৪)

আমরা যখন যুবকদের এইসব বিষয়ে তারবিয়াত ও প্রশিক্ষণ দেবো, তারা মানুষের মান-সম্মান-সম্ভ্রম, তাদের ধন-সম্পদ এবং তাদের রক্তের ব্যাপারে নিরাপদ ও বিশ্বস্ত থাকবে।

তাফসীর ও ব্যাখ্যা

সুরা আন-নাস

(আয়াত ৬ টি; রুকু ১ টি; মদিনায় অবতীর্ণ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ(١)مَلِكِ النَّاسِ(٢)اِلٰهِ النَّاسِ(٣)مِنْ شَرِّ
الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ(٤)الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ(٥)مِنَ الْجِنَّةِ
وَ النَّاسِ(٦)

অনুবাদ

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়

১. আপনি বলুন ‘ আমি তাঁরই আশ্রয়ে এসেছি, যিনি সকল মানুষের প্রতিপালক ২. সকল মানুষের বাদশাহ্‌ ৩. সকল লোকের মা'বুদ ৪. তারই অনিষ্ট থেকে, যে অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় এবং আত্মগোপন করে, ৫. যে মানুষের অন্তরসমূহে কু-প্ররোচনা ঢালে, ৬. জ্বিন ও মানুষ।

সুরা নাসের ফযীলত বা মাহাত্ম্যঃ- বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদিসে বর্ণিত আছে হুযুর রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত্রের বেলায় যখন বিছানা মোবরকে তাশরীফ নিতেন, তখন আপন মুবারক হস্ত দ্বয় এ কত্রিত করে এর মধ্যে ফুঁক দিতেন এবং সুরা ইখলাখ, সুরা ফালাক্ব এবং সুরা নাস পড়ে স্বীয় মোবারক থেকে শুরু করে সমস্ত শরীরসুবারকে বুলাতেন। যতদুর হাত সোবারক পৌঁছাতে পারতো এরূপ আমাল তিনবার করতেন।

শানে নুযুলঃ- এইসুরা এবং এর পরবর্তী সুরা সুরা নাস ঐ সময়ে যখন লাবীদ ইবনে আসেম ইহুদী ও তার কণ্যাগণ হুযুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যাদু করেছিল এবং হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেহ সুবারক ও পবিত্র প্রকাশ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সেটার প্রভাব পড়েছিল, পবিত্র ক্বালব (হৃদয়), আক্বল (বিবেক বুদ্ধি) ও ইতিক্বদ (অন্তরের বিশ্বাস) এর উপর কোন প্রভাব পড়েনি। কিছুদিন পর হযরত জীব্রাইল আলাইহিস সালাম আসলেন। তিনি আরয করলেন। এক ইহুদী আপনার উপর যাদু করেছে এবং যাদুর যা কিছু উপকরণ রয়েছে তা অমুক কুপে একটি পাথরের নিচে চাপা দিয়েছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী মুতাজা রাদ্বিয়াল্লা আনহুকে পাঠালেন তিনি কুপের পানি সেচে পাথর উঠালেন এবং এর মধ্যে ছিল হুযুর পাক হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র চুল মো বারক। চিরুনি মুবারকের কয়েকটি দাঁত ও একটি রশি অথবা ধনুকের রশি একটি মোমের পুতুল যাতে এগারটি সুঁচ গাঁধা ছিল। এ স ব উপকরণ পাথরের নিচ থেকে বের করে হুযুরের দরবারে পেশ করা হলো। আল্লাহ তায়ালা এই দুই টি সুরা অবতীর্ণ করেন।

হাদীস শরীফের দ্বারা আক্বাইদ শিক্ষা

মুফতী মুহাম্মাদ সাফাউদ্দিন সাক্বাফী আল আশরাফী, পশ্চিম বর্ধমান।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦١﴾

অনুবাদ ঃ এবং যারা আল্লাহর রাসুলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

(সুরা তাওবা আয়াত -৬১)

(রবিউল আওয়াল ২০২৩ এর পরবর্তী অংশ)

ক্বুরআন শরীফে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ- وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ . অনুবাদঃ - যে ব্যাক্তি সেটাব (কাবা শরীফ) অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তার মধ্যে থাকে--: । (সুরা -আল ইমরান আযাত-৯৭)।

english translation and whosoever enters it, is in security.

এই আয়াত শরীফ থেকে পানির মতো পরিস্কার হয়ে যায় যে,কাবা শরীফে যদি কেউ পানাহ বা আশ্রয় নেয় তাহলে সে নিরাপত্তা লাভ করবে অর্থাৎ কেউ কাবা শরীফে আশ্রয় নিলে তাকে হত্যা করা যাবেনা। কিন্তু যদি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শত্রু কাবা শরীফেও আশ্রয় নিলেও থাকে হত্যা করা যাবে।

হাদিস শরীফ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ ابْنُ خَطَلٍ: مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا نُرَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا".

অনুবাদঃ— হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের দিন নাবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথায় লোহার টুপি পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেছেন। তিনি আলাইহিস সালাম সবেমাত্র টুপি খুলেছেন এ সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, ইবনে খাতাল কাবার গিলাফ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। নবীয়ে কারীম. সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তাকে হত্যা কর।

ইমাম মালিক রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমাদের ধারণামতে সেদিন নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহরাম অবস্থায় ছিলেন না। তবে আল্লাহ আমাদের চেয়ে ভাল জানেন।

(আবুদাউদ শরীফ,সহীহুল বুখারী হাদীস শরীফ নাং-৩৯৫৭)।

ইহরাম অবস্থায় একটি মশা কিংবা মাছি পর্যন্ত মারার হুকুম নাই। যদি কেউ উক্ত ভূলটি করে তাহলে তাকে দম অর্থাৎ বদলা দিতে হবে। কিন্তু আমাদের প্রিয় রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে খাতালকে মারার হুকুম দিলেন। এবং জগৎবাসীকে দেখিয়ে দিলেন যে নাবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুশমন বা শত্রু জন্য কোন ছাড় নাই,সে যেখানেই থাকুক না কেন।

এই কূখ্যাত ইবনে খাতাল কে?

আল্লামা ইউসুফ সালেহী শামী আলাইহির রাহমা বলেন ইবনে খাতাল হল একজন ইসলামের শত্রু, জাহিলিয়্যাতের যুগে ইবনে খাতালের নাম ছিল আবদুল উযযা। সে কুফর ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহন করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে আবার মুরতাদ হয়ে যায় এবং অন্যায়ভাবে একজন মুসলমানকে হত্যা করে পালিয়ে যায়। তার দুটি গায়িকা বাঁদি ছিল এদের মাধ্যমে সে নাবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানদের কুৎসাজনিত গান শুনিয়ে মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়াত। এ জন্যই নাবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা জয় করেন, তখন তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। এবং তাকে হত্যা করা হয়। আর গায়িকা বাঁদীদ্বয়ের মধ্যে একজনকে নাবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশে হত্যা করা হয়েছিল। অপরজন ইসলাম গ্রহণের কারণে মুক্তি মুক্তি পেয়েছিল।

(নিয়ামাতুল বারী শারাহে বুখারি খণ্ড-৪,পৃষ্ঠা-২৮৯)।

আক্বীদা ও লাভ

এই হাদীস শরীফ থেকে বুঝতে পারাগেল যে,

১) কাবা শরীফে কেউ আশ্রয়নিলে তাকে হত্যা করা নিষেধ।

২) তবে নাবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শত্রুকে ছাড়া যাবে না।

নাবীর শত্রুর একটিই সাজা, শরীর থেকে মাথা জুদা (আলাদা)।

৩) এই হাদীস শরীফ থেকে আমাদের শিক্ষানিয়ে এধরণের আক্বীদা রাখতে হবে যে,কোন বদমাযহাব এবং ওহাবীদের সাথে কোন ভাবেই সম্পর্ক রাখা যাবে না।

হাদীস শরীফ

হযরত আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,এক খৃষ্টান ব্যক্তি মুসলমান হল এবং সূরা বাকারা ও সূরা আল-ইমরান পড়া শিখে নিল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য সে অহি লিপিবদ্ধ করত। তারপর সে পুনরায় খৃষ্টান হয়ে গেল। সে বলতে লাগল,আমি হাযরাত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যা লিখে দিতাম তার চেয়ে অধিক কিছু তিনি জানেন না। (নাউজুবিল্লাহ)। কিছুদিন পর আল্লাহ তাকে মৃত্যু

দিলেন। খৃস্টানরা তাকে যথারীতি দাফন করল। কিন্তু পর দিন সকালে দেখা গেল,কররের মাটি তাকে বাইরে নিক্ষেপ করে দিয়েছে। তা দেখে খৃষ্টানরা বলতে লাগল এটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণেরই কাজ। যেহেতু আমাদের এই সাথী তাদের থেকে পালিয়ে এসেছিল। এ জন্যই তারা আমাদের সাথীকে কবর থেকে উঠিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে। তাই যতদূর সম্ভব গভীর করে কবর খুড়ে তাতে তাকে পুনরায় দাফন করল।

কিন্তু পরদিন দেখা গেল,কবরের মাটি তাকে (গ্রহন না করে) আবার বাইরে ফেলে দিয়েছে। এবারও তারা বলল,এটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবীদের রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণেরই কান্ড। তাদের নিকট থেকে পালিয়ে আসার কারণে তারা আমাদের সাথীকে কবর থেকে উঠিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে। এবার আরো গভীর করে কবর খনন করে সমাহিত করল। পরদিন ভোরে দেখা গেল কবরের মাটি এবারও তাকে বাইরে নিক্ষেপ করেছে। তখন তারাও বুঝতে পারল,এটা মানুষের কাজ নয়। কাজেই তারা শবদেহটি বাইরেই ফেলে রাখল।(এবং পচে শিয়াল কুকুরের দ্বারা ভক্ষন হল)

(আরবী বুখারী শরীফ হাদীস নং-৩৬১৭)।

আক্বীদা ও লাভ

১) ইমাম বাদরূদ্দিন আইনি আলাইহির রাহমা বলেন এই হাদীস শরীফ থেকে হুযুর নাবীয়ে কারীম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুযিযা প্রমাণিত হয় যে,কেউ যদি মুরতাদ হওয়ার পরেও নাবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গুস্তাখী করে তাকে মাটি ক্ববুল করে না,বাইরে ছুড়ে ফেলে দেয়। (নিয়ামাতুল বারী খণ্ড-৬,পৃষ্ঠা-৬৬৪)।

২) নাবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শত্রুকে মাটিতে পর্যন্ত চেনে তাইতো তাকে ক্ববর থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে।

৩) নাবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শত্রুগণ আখিরাতে কখনও লাভবান হবেনা।

টুকরো খবর

গত ৩০ ডিসেম্বর সাগরপাড়া থানার অন্তর্গত ধনীরামপুর রেজা কমিটির উদ্যোগে উক্ত গ্রামে মাসলাকে আলা হযরাত কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। যার প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন **মুফতী গোলাম সামদানী রেজবী সাহেব**, মূখ্য অতিথি হিসেবে **মুফতী নঈমুদ্দিন রেজবী সাহেব** ও **মুফতী নুরুল আরেফিন রেজবী সাহেব**। প্রধান বক্তা সুলহে কুল্লি বক্তার আলাউদ্দিন জেহাদীর রদ করতঃ সৈয়দ আহমদ রায়বেরেলীর ওহাবীবাদকে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রমাণ পুস্তকাদির আলোকে উপস্থাপন করেন। পশ্চিমবঙ্গের সুন্নী মাসলাকে আলা হযরতের বিরোধীতা করার জন্য যে দুটি পরিকল্পনা যেমন দারুল হুদা ও আলাউদ্দিন ফ্যাসাদী কে যারা প্রশ্রয় দিয়েছে তারাও সমদোষী- একথা **খলিফায়ে হুযুর জামালে মিল্লাত নুরুল আরেফিন রেজবী** উল্লেখ করেন। পরিশেষে, **মুফতী নঈমুদ্দিন রেজবী সাহেব** হাদিসের আলোকে সুন্নীদের মাসলা মাসায়েল সাব্যস্ত করেন।

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র নামায হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিতে (সম্পূর্ণ দলীল ভিত্তিক)

নামায শুরুর পূর্বে কতিপয় মাসলা

১. উযুর দ্বারা হাদসে আসগর বা ছোট নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়া। (সুরা মায়েদা-৬, বুখারী শরীফ-হাদিস নং ১৩৭, মুসলিম-হাদিস নং ৪৩০, আবু দাউদ হাদিস নং ৬০, ও তিরমীযি ৭৬)

২. জানাবাত হতে পবিত্র হতে ফরয গোসল করা। (সুরা মায়েদা-৬, সুরা নিসা-৪৩, বুখারী শরীফ ২৭২, মুসলিম ১২৪৪, আবু দাউদ - ২৩৫ ও নাসাঈ ৭৯৩)

৩. শরীরে নাপাকী লেগে থাকলে ধুয়ে পবিত্র করা। (মুসলিম-৪২৮, তিরমীযি-১, ইবনে মাযা-২৭২, মুসনাদে আহমদ-৪৯৬৯)

৪. কাপড়ে নাপাকী লেগে থাকলে পানি দ্বারা ধুয়ে পবিত্র করা। (বুখারী-২৭৭ ও ২২৯, আবু-দাউদ- ২১০, তিরমীযি-১১৫, ইবনে মাযা-৫০৬ ও সহীহ ইবনে খুযাইমা-২৯১)

৫. নামাযের জায়গা পবিত্র রাখা। (সুরা বাক্বারা-১২৫, ইবনে মাযা-৭৫৮ ও তিরমীযি-৫৯৪)

৬. সতর ঢাকাসহ নামাযের জন্য উত্তম পোশাক পরিধান করা। (সুরা আ'রাফ-২৬ ও ৩১, মুসলিম-৬৬৬ ও আবু দাউদ ৩৯৭৫)

৭. উত্তম পোশাক হিসেবে টুপি পরা। (বুখারী-৫৩৮৭ ও ২৬৪ নং পরিচ্ছদ, ইবনে শাইবা-৬৫৩৬ ও ২৫৪৮৯, আবু দাউদ-৯৪৮ ও মুসতাদরাকে হাকিম)

৮. উত্তম পোশাক হিসেবে পাগড়ী পরা। (বুখারী-৫৩৮৭ ও ২৬৪ নং পরিচ্ছদ, ইবনে আবী শাইবা-২৭৫৪ ও ২৫৪৮৯, মুসলিম-৫২৬, নাসাঈ-১০৯, মুয়াত্তা মালেক, ১/৮৭ ও জামেউল উসুল-৩৮৯৮)

৯. নামাযের নিয়াত করা। (সুরা বাইয়্যানাত-৪, বুখারী-১, মুসলিম-৪৭৭৪, আবু দাউদ-২১৯৮, তিরমীযি-১৬৫৩, ইবনে মাযা -৪২২৭, নাসাঈ-৭৫, জামেউল উসুল-৯১৬৩)

১০. দু'পায়ের মাঝখানে স্বাভাবিক ফাঁকা রেখে দাঁড়ানো। (ইব নে আবী শাইবা ৭১৩৫ ও ৭১৩৬ ও নাসাঈ ৮৯৫)

১১. পরিধেয় কাপড় সর্বাবস্থায় টাখনুর উপরে রাখা বিশেষ করে নামাযের সময়। (আবু দাউদ ৬৩৬)

নামায শুরুতে কতিপয় মাসলা

১. বড় ধরণের ওযর ব্যতীত নামায দাঁড়িয়ে আদায় করা। (সুরা বাক্বারা-২৩৮, বুখারী-১০৫১, তিরমীযি-৩৭২, আবু দাউদ-৯৫২ ও জামেউল উসুল-৩৩৯৯)

২. তাকবীরে তাহরীমা বলার পূর্বে উভয় হাত উঠিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতি বরাবর করা। (মুসলিম-৭৫২, আবু দাউদ ৭৪৫, নাসাঈ-১০২৭, মুসনাদে আহমদ-১৫৬০০, মুসতাদরাকে হাকেম-৮২২, জামেউল উসুল-৩৩৯২, শামী ঃ ১/৪৮২)

৩. হাতের তালু ক্বীবলামুখী রাখা। (আল মু'জামুল আওসাত লিত তাবরানী-৭৮০১, মা'রিফাতুস সাহাবা-১০৩৩)

৪. তাকবীর তাহরিমার সময় আঙ্গুল সমূহ খোলা রাখা। (মুসতাদরাকে হাকেম-৮৫৬, তিরমীযি-২৩৯, মুসনাদে বাযযার-৮৪১৩, সহীহ ইবনে খোযাইমা-৪৫৮, ও আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী-২৩১৮)

৫. মহিলাদের তাকরীরে তাহরীমার সময় হাত দ্বয় কাঁধ পর্যন্ত উঁচু করা। (ইবনে আবী শাইবা-২৪৮৫, ২৪৮৭, আল মু'জামুস কাবীর খন্ড ২২/ ১৯ পৃঃ)

৬. আল্লাহু আকবার বলে নামায শুরু করা। (সুরা আলা-১৪ ও ১৫, তিরমীযি-৩, আবু দাউদ-৬১, ও ইবনে মাযা-২৭৫, ২৭৬ ও ১০৬০)

৭. তাকবীরে তাহরীমা, ক্বুরআন তিলায়াত, তাসবীহ ও দুআ সহ নীরবে পড়ার সকল বিষয় এতটুকু শব্দে উচ্চারণ করা যেন নিজ কানে শুনা যায়। (বুখারী-৭২৪, বাদায়েউস সানায়ে ১/১৬১, শামী ১/৪৮১ ও ৫৩৪)

৮. তাকবীর তাহরীমা ব্যতীত অন্য স্থানে রাফা-ইয়াদাইন না করা।
(তিরমীযি-২৫৭, নাসাঈ-১০২৯, আবু দাউদ ৭৪৮, ৭৪৯ ও ৭৫০, দারু কুতনী-১১২১, মুসনাদে আহমদ-২২৩৫৯, মুসনাদে হুমাইদী-৬২৬, ইবনে আবী শাইবা-২৪৬৯, ২৪৫৭, ২৪৫৮ ও ২৪৬৭, ত্বাহাবী ১/১৬৩ ও ১৬৪ পৃঃ হাদিস নং ১৩৫৩, ১৩৫৪, ১৩৫৭, ১৩৬৩, ও ১৩৬৪; মুসান্নাফ ইবনে আব্দুর রাজ্জাক রাযযাক ২৫৩৩ ও ২৫৩৪)

৯. তাকবীরে তাহরীমা বলতে বলতে হাত নামিয়ে ডান হাতের পাঞ্জা দ্বারা বাম হাতের কব্জি ধরা। (বুখারী ২/৩৩০, আল মাতালিবুল আলিয়া-৪৬০, ইবনে আবী শাইবা -৩৯৬১ ও ৩৯৬৩)

১০. ডান হাতের পাঞ্জা দ্বারা বাম হাতের কব্জী ধরে নাভির নিচে রাখা। (ইবনে আবী শাইবা-৩৯৫৯, ৩৯৬০,৩৯৬৩ ও ৩৯৬৬; আবু দাউদ হাদিস নং ৭৫৬, মুসনাদে আহমদ-৮৭৫, দারকুতনী-১১০২ ও ১১০৩ এবং আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২৩৪০, ২৩৪১ ও ২৩৪২)

১১. হাত বাঁধার পরে ছানা অর্থাৎ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা বা হাদিসে বর্ণিত অন্য কোন সানা পড়া। (মুসলিম- হাদিস নং ৭৭৭, আবু দাউদ হাদিস নং ৭৭৫, ৭৭৬, তিরমীযি-২৪২, ২৪৩, ইবনে মাজা-৮০৬, নাসাঈ ৯০২, ত্বাহাবী ১/১৪৫ হাদিস নং ১১৭৫ ও ১১৭৬ এবং আল-মু'জামুল আওসাত লিত তিবরানী -৩০৩৯)

১২. নারীদের জন্য ডান হাতের পাঞ্জা বাম হাতের পাঞ্জার উপর রেখে সীনার উপর রাখা। (শামী ঃ ১/৪৮৭, আস সিআয়াহ ২/৫৬)

১৩. নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় এদিক ওদিক না তাকিয়ে দৃষ্টি সিজদার স্থানে নিবদ্ধ রাখা। (বুখারী শরীফ ৭১৫, তিরমীযি ৫৮৯ এবং ইবনে আবী শাইবা ৬৫৬৩ ও ৬৫৬৪)

(চলবে)

---------- ১৯ পাতার পর ⬇

ঃ রাতে নামায দুই দুই রাকায়াত আদায় করো। যখন তোমাদের মধ্যে কারও ফজরের আশঙ্কা হয়, সে যেন (শেষের দু'রাকায়াতের সহিত) এক রাকায়াত আদায় করে নেয় এবং এটা তার আদায়কৃত নামায কে বেত্র বানিয়ে দেবে। (বুখারী শরীফ হাদিস নং ৯৯০)

২. হযরাত নাফে'য় রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, হযরাত আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বিতরের এক রাকায়াতে এবং দু'রাকায়াতে মধ্যবর্তীতে সালাম ফিরতেন। এমনকি নিজের প্রয়োজনে হুকুম প্রদান করতেন। (বুখারী শরীফ হাদিস নং ৯৯১)

■ **বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ** উক্ত হাদীস দ্বয়ের দ্বারাও প্রকৃত পক্ষে বিতর তিন রাকায়াতই সাব্যস্ত হয়।

■ **ব্যাখা ঃ ইমাম আবু আহমদ বিন মুহাম্মাদ আত্ব-ত্বাহাবী (ওফাত ৩২১ হিজরী) লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ** উক্ত আসরের দ্বারা জানা যায় যে, হযরাত ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বিতরের এক রাকায়াত এবং দুই রাকায়াতের মধ্যবর্তীতে পার্থক্য করতেন। এর উত্তর হল যে, হযরাত ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর কৃত ছিল এটা এবং তাঁর ব্যক্ত হল এর বিপরীত। কৃত কর্মের চেয়ে ব্যক্ত হল অধিক গ্রহণযোগ্য। হযরতে ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ব্যক্ত হল যে, উরুবা বিন মুসলিম বর্ণনা করেন, আমি হযরাত আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কে বিতরের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন ঃতোমরা কী দিনের বেলার বিতরকে চিনতে পার? আমি বললাম, জি হাঁ। এটা হল মাগরীবের নামায । তিনি ফরমালেন ঃ তুমি সঠিক বলেছ। কিংবা উত্তম বলেছ। পূণরায় বলেন ঃ আমরা মাসজিদে বসে থাকতাম একজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলেন বিতর কিংবা তাহাজ্জুদের নামায প্রসঙ্গে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমালেন ঃ রাতের নামায দুই দুই রাকায়াত, যখন তোমাদের ফজর হওয়ার আশঙ্কা থাকবে (শেষ দুই রাকায়াতের সহিত) এক রাকায়াত মিলিয়ে নিয়ে নামাযকে বিতর করবে।

মালিক ও মুখতার নাবী

(সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

মুফতী নঈমুদ্দিন রেজবী সাহেব

----------(পূর্ব সংখ্যার পর)

হাদিস নং ১৯

সহি হাইনে মাওলা আলী কাররা মাল্লহু অজুহু হুল কারীম হতে বর্নিত রসুলুল্লাহ আলাইহি অ স্সালাম বলেছেন মদিনার আইর থেকে সোর পাহার পর্য্যন্ত সম্মানিত তার ঘাস কাটবে না এবং শিকার কে উত্তেজিত করবে না।

হাদিস নং ২০

সহিহ মুসলিম শরীফে সাহল বিন হানিফ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্নিত। হুজুর নিজ হস্ত মুবারক দ্বারা ইশারা করে বলেছেন। নিশ্চয়ই এই শান্তি দায়ক হেরেম শরীফ ইমাম আহমদ তহাবী ও আওাল।

হাদিস নং ২১

ইমাম আহমদ আবুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা হতে বর্নিত। রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু তায়ালা আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন প্রত্যেক নবীর জন্য সম্মানের স্থান আছে আমার জন্য সম্মানের স্থান মদিনা শরীফ।

হাদিস নং ২২

আব্দুর রাজ্জাক হজরত জাবির বিন আদিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্নিত হুজুর আলাইহি অ স্সালাম নিষেধ ঘোষনা করেছেন প্রত্যেক মানুষকে যারা মদিনায় হাজিরা দিবেন তাদের কে কাঁটাদার বৃক্ষ কাটা নিষেধ।

হাদিস নং ২৩

ইমাম তহাবী ব্যতিরিকে মালিক তিনি ইউনুসবিন ইউসুফ থেকে তিনি আতা বিন ইয়া সার থেকে বর্ণনা করেন। কিছু ছেলেরা একটি রুবাহ নামক জীবকে তাড়া করে এক কোনায় ঘিবে ফেলে ছিল হজরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু ছেলেদের দ্বারে হঠিয়ে দিলেন ইমাম মালিক বলেন আমি বিশ্বাসের সহিত বলছি আমার একটাই স্বরন আছে। কি ? হুজুরের হেরেম শরীফে এই রকম করা যায়?

হাদিস নং ২৪

মুসনাদুল ফিরদাওসে হজরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তারালা আমবু হতে বর্নিত রসুলুল্লাব সাল্লালাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন আল্লাহু তায়ালা এই বাকিতে এবং দুই সম্মানিত জায়গায় সত্তর হাজার ব্যাক্তিকে এমন ভাবে উঠাবেন তারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবেন এবং তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যাক্তি সত্তর হাজার ব্যাক্তিকে শাফায়াত করবেন, তাহের চেহারে পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জল হবে উল্লিখিত হাদিস গুলি যদি গননা করা যায় যে সমস্ত হাদিসে মক্কা মোয়াজ্জামা এবং মদিনা তয়েবাকে হারা মাইন করেছেন তবে অনেক অনেক হাদিস পাওয়া যাবে যে সমস্ত হাদিস সর্ব্ব সময় নির্ভর যোগ্য অশিকার করার কোন উপায় নাই পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত প্রমান হল মুস্তফা সাল্লালাহু আলাইহি অ সাল্লাম মদিনা শরীফের জঙ্গল কে পূর্ণ তাকিদের সহিত আদব করার আদেশ দিয়েছেন যেমন মক্কা শরীফের জঙ্গলের। এত দাসত্তে ও তয়েফা তালেফা ওহাবীর বদ ইমাম মুখ ফেড়ে ফেড়ে বলেছে এবং পরিস্কার ভাবে লিখেছে মক্কা মদিনার আসে পাশের জঙ্গলের আদর করা সেখানে শিকার না করা বৃক্ষ না কাটা এই কাম আল্লাহু তায়ালা নিজের নিজের এবাদতের জন্য বলেছেন এখন যদি কেও কোন পীর পয়গম্বব কিংবা ভূত পেরত পরীরের বাড়ীর জঙ্গলের আদব করে তাহলে শিরক সাবেত হবে এই কারণে কি ?

আমি বলি নাই এই না পাক অপবিত্র মালাউনি মাজহাব বাহির হয়েছে এক মাত্র আল্লাহু ও তার রসুলের শিরকের আদেশ দেয়ার জন্য অন্য লোকেব কি গনতা। আফসোস হাজার বার বেদিন চেহারা ধারী লাগাম বিহীন মুকাল্লিদ বড় বড় তোহিদের প্রচারক ওলি গুলি হাটে ঘাটে ফিরে বেড়াচ্ছে নিজ ইমামের সঙ্গ দেয় ইয়া মুহাম্মাদার রসুলুল্লাহ বলতে লজ্জা বোধ করে আল্লাহু তায়ালা অ গনিত দরুদ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহু সাল্লালাহু

আলাইহি অ সাল্লালামের প্রতি এবং আদব দার গোলামের প্রতি নাজিল হউক হুজুর আলাইহি অ স্সালাম যে কথার আদেশ দিবেন ইমামুত্তয়েফা প্রকাশ্য বলবে এটা তো শিবক এখন দেখা যাক ওহাবী কার কালেম পড়ে তাম্বীহ সাবধান মুসলমান শুধু এটাই নয় সেই পথ ভ্রষ্ট ইমামুত্তয়েফার মাজহাবে যে ব্যাক্তি হুজুর আকরাম সাল্লালাহু আলাইহি অ সাল্লামের জিয়ারতের উদেশ্য মদিনা তয়েবায় যায়, যদি ও বা চার পাঁচ কোস হয় অথাৎ দশ বারো মাইল হয় সম্মানিত সহিত যাওয়া চলবে না ওহাবীদের কথায়। মদিনার রাস্তায় বেআদবী বেহুদা গিরী বদ মাইসী করতে করতে চলা তাদের জন্য ফরজে আইন এবং ঈমানের অংশ। তাদের ধর্মে আমাদের আকা মালিক ও মুখতার সাল্লালাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইজ্জত সম্মান ও জালালের খেয়ালে আদবের সহিত দেলে তাদের নিকট মুশরিক হয়ে যাবে। সেই ওহাবীদের পথ ভ্রষ্ট কিতাবে আছে সেই জায়গায় অকথ্য পরিহার করা ও শিরকের মধ্যে গননা করেছে। আল্লাহর উপর ঝুট মিথ্যা আরোপ করে বলেছে এই সমস্ত কাম আল্লাবু তায়ালা নিজের এবাদতের জন্য নিজের বান্দাকে বলেছে কিন্তু যদি কেও কোন পীর পয় পয়গম্বরের জন্য করে তবে শিরক সাবেত হবে সুবহানাল্লাহ অসভ্য কথা বলা নাজদীদের ঈমানের অংশ তাদের ঈমান ও ঐ রকমই মুজতাহেদুত্তয়েফা এই কথা লিখার সময় স্বরন ছিল না। আয়াতে কারীমা

মদিনার রাস্তায় অসভ্য কথা বলা ফাসেকী ফাজেরী কবে. চলা ফরজ বলে দিত সেখানে ফাসেকী কর্ম না করিলে মুশরীফ হয়ে যাবে।

লা হাওলা ওলা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়িল আজিম এই হল ওহাবীদের চরিত্র।

লতিফা হাক্কাহু নাজদী গন আল্লাহর ওয়াস্তে বিবেচনা কর, এবাদতেরর কর্ম থেকে বাঁচা শুধু আম্বিয়া ও আওলিয়া গনের ক্ষেত্র খাস না আপশে এক অপরের সঙ্গে শিরক করা জায়েজ নয় ? ওহাবী গনের কথায় গায়ের খোদার সম্মান করিলেই শিরক। তাহলে তোমার যখন বন্ধু বান্ধব নজির বাশির কিংবা পীর ফকির মুরীদ দোস্ত প্রিয়র নিকট যাবে তখন রাস্তায় লড়তে লড়তে ঝগড়া করতে করতে এক অপরের মাথা ফাটিয়ে মাথা ঠেকিয়ে রাস্তায় চলবে নতুবা মুশরিফ নিজের এবাদতের জন্য বান্দাকে বলেছেন হজ্বের সময় ছাড়া কি করতে হবে? জুতা ছোড়া চুরি করলে এক সঙ্গে তিনটি সাজা পাবে জেদাল ফাসেক রাফাস ঝগড়া ফাসেক অসভ্যতা এই হল নাজদীদের ঈমান পূর্ণ তিন রকুন লা হাওলা অল ফুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়িল আজিম।

যদি বলা যায় হুজুর আলাইহি অ স্সালাম এই কথা ফরজ করেছেন এই কাম হারাম করেছেন তখন।

-------- ২০ **পাতার পর** ⬇⬇⬇⬇

মাকরুহ তাহরিমী ঃ এটা হল ওয়াজিবের বিপরীত। এরূপ হলে ইবাদত অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এরূপ কৃতকারী হল গুনাহাগার। যদিও এরূপ করা হল হারাম গুনাহ হতে লঘু। কিন্তু বারংবার করলে গুনাহে কাবীরার দোষে সাব্যস্ত হবে।

মাকরুহ তানযিহী ঃ এরূপ করা হল শরীয়তে অপছন্দনীয়। কিন্তু এ পর্যায়ের নয় যার দ্বারা আযাবের অংশীদার হবে।

খেলাফে আওলা ঃ যে কর্মটি না করায় হল উত্তম, তবে যদি করে নেয় তাহলে অসুবিধা নেই।

যাকাত ও ফিতরা সম্পর্কে খুঁটিনাটি মাসলা

শরীয়তের পরিভাষায় যাকাত বলা হয়, আল্লাহর ওয়াস্তে কোন মুসলমান ফকীরকে সম্পদের শরীয়ত নির্ধারিত একটি অংশের মালিক বানিয়ে দেওয়া।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত সমূহ

১.মুসলমান হওয়া ২.বালেগ হওয়া ৩.বিবেককবান হওয়া ৪.আযাদ হওয়া ৫.নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া ৬.পূর্ণভাবে মালিক হওয়া ৭.নেসাব ঋণমুক্ত হওয়া ৮.নেসাব ব্যবহারিক সামগ্রী থেকে মুক্ত হওয়া ৯.সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া ১০.বছর অতিবাহিত হওয়া।

■ **মালিকে নেসাব কাকে বলে ?**

মালিকে নেসাব বা নেসাবের অধিকারী বলতে মুল ব্যবহারিক সামগ্রী ছাড়া দুশত দিরহাম অর্থাৎ সাড়ে বাহান্ন তোলা চান্দি বা বিশ মিসকাল অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের মালিক হওয়া কে বোঝায়।[১]

বর্তমান সময়ে এক তোলার ওজন হল ১২ গ্রাম ৪৪১ মিলি গ্রাম (প্রায়)। এই হিসাব অনুযায়ী সাড়ে বাহান্ন তোলা চান্দির ওজন হবে ৬৫৩ গ্রাম ১৮৪ মিলি গ্রাম।[২]

বর্তমানে যে ব্যক্তি'র নিকট মুল ব্যবহারিক সামগ্রী ব্যতীত সাড়ে বাহান্ন তোলা চান্দি (৬৫৩ গ্রাম ১৮৪ মিলি গ্রাম) কিংবা তার মুল্য পরিমান অর্থ বর্তমান সেই মালিকে নেসাব বলে গণ্য হবে।[৩] অর্থাৎ তার উপর যাকাত এবং সদকায়ে ফেতর ওয়াজিব।

পরিমাণ হবে তখন সেগুলি যাকাত হল চল্লিশ ভাগের একভাগ।

■ **যাকাতের হিসাব কিরূপ ?**

এত পরিমাণ সম্পদ যা নেসাব পর্যন্ত পৌঁছে যায়, সেক্ষেত্রে শতকরা ২.৫% (আড়াই) অর্থাৎ সমগ্র সম্পদের ৪০ ভাগের একভাগ যাকাত বের করতে হবে। সুতরাং সোনা, চান্দি যখন নেসাব।

বাহারে শরীয়তের মধ্যে সাদরুশ্ শরীয়া মুফতী আমজাদ আলি আলাইহির রহমা ইরশাদ করেন,সোনা, রুপো ব্যতীত ব্যবসায়িক সম্পদের যে কোন বস্তু হোক না কেন, যার মূল্য সোনা রুপোর নেসাব পরিমাণ পৌঁছে যায়, তার উপরও যাকাত ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ, মূল্যের চল্লিশ ভাগের একভাগ। [৪]

মাসয়ালা ঃ- ব্যবসায়িক সামগ্রির মূল্য যদি নেসাব পর্যন্ত না পৌঁছায, কিন্তু তার নিকট ঐ সকল ছাড়া সোনা চান্দিও থাকে এবং সেগুলির মূল্য সোনা চান্দির সহিত মিলিতভাবে নেসাব পরিমাণ পৌঁছে যায়, সেক্ষেত্রেও যাকাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। [৫]

মাসয়ালা ঃ - ব্যবসায়ি সামগ্রির মূল্য সেই স্থানে প্রচলিত মূল্যের উপর ধর্তব্য হবে। [৬]

মাসয়ালা:-কারও নিকট যদি কিছু অর্থ,কিছু সোনা ও চান্দি থাকে এবং সকলেব মিলিত মূল্য যদি সাড়ে বাহান্ন তোলা চান্দির মূল্যের সম পরিমাণ হয় ,তাহলে সেই ব্যক্তিও মালিকে নেসাব রূপে গণ্য হবে এবং বছর পূর্ণ হবার পর তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। [৭]

মাসয়ালা:- নিজের মুল অর্থাৎ পিতা-মাতা, দাদা-দাদি,নানা-নানি প্রমূখ আর যাদের সন্তান আছে -নিজেরসন্তান,পুত্র-কন্যা,নাতি-নাতনি,পোতা-পোতি প্রমূখকে যাকাত প্রদান করা নিষিদ্ধ।[২]

মাসয়ালা:- যাকাত ঘোষণা সহকারে দেওয়া উত্তম। নফল সাদ্কা গোপনে দেওয়া উত্তম।

মাসয়ালা:- ফকীর আলেম কে সাদক্বা করা জাহেল ফকীর কে সদক্বা করা অপেক্ষা উত্তম। [৯]

মাসয়ালা:- যাকাতের অর্থ কাফের, মুশরীক, ওহাবী (দেওবন্দী, জামাতে ইসলামী, গায়ের মুকাল্লিদ), রাফেজী, ক্বাদীয়ানী প্রভৃতি বাতিল সম্প্রদায়দের দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এদেরকে ঐ অর্থ প্রদান করলে যাকাত অনাদায় থেকে যাবে।[১০]

. ১.দুররে মুখতার,রাদ্দুল মুহতার ২ য় খন্ড ৩৮-৪০ পৃ:, ২.ফাতওয়া মারকাযে তারবিয়াতুল ইফতা১/৪০৯ পৃ:,মাহানামা আশরাফিয়া মে সংখ্যা ২০০৪, ৩. রাদ্দুল মুহতার ২/৩০০ পৃ:, ৪. বাহারে শরীয়াত ১/৯০৩ পৃঃ, মাকতাবতে মদিনা, ৫. বাহারে শরীয়াত ১/৯০৩ পৃঃ, মাকতাবতে মদিনা, ৬. বাহারে শরীয়াত ১/৯০৩ পৃঃ, মাকতাবতে মদিনা, ৭.রাদ্দুল মুহতার ২/৩০০ পৃ:, মারকাযু তারবিয়াতুল ইফতা ৪০৮ পৃ:, ৮.রাদ্দুল মুহতার -কেতাবুত যাকাত ৩/৩৪৪পৃ:, ৯.ফাতওয়া হিন্দিয়া-কেতাবুয যাকাত ১ম খন্ড, ১০. ফাতওয়া হিন্দিয়া-কেতাবুয যাকাত ১/১৮৭ পৃ:।

মাসয়ালা:- মোবাইলের মূল্য যদি নেসাব পরিমান হয় কিংবা এর অধিক হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। কারণ মোবাইলও হাজাতে আসলিয়া বা ব্যবহারিক সামগ্রীর অর্ন্তভূক্ত।[১১]

যাকাত প্রদানের খাত সমূহ

যাকাত প্রদানের খাত বলতে যেখানে যেখানে যাকাত প্রদান করা যাবে সেগুলিকে বোঝায়। যাকাতের অর্থ প্রদান করার বিভিন্ন খাত রয়েছে।

১. ফক্বীর ঃ- যাকাত প্রদানের প্রথম খাত হল ফক্বীর। ফক্বীর বলতে. এমন ব্যক্তিকে বোঝায়, যার কিছু মাল আছে কিন্তু তা নিসাব পরিমাণ নয়, অথবা নিসাব পরিমাণ বটে কিন্তু তা বর্ধিত মাল নয়, অথবা প্রয়োজন অতিরিক্তও নয়।

২. মিসকীন ঃ- দ্বিতীয় খাত হল মিসকীন। মিসকীন হল এমন ব্যক্তি যার কিছুই নেই এবং যে খাওয়া-পরার জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হতে বাধ্য হয়। মাসলা ঃ মিসকীনের জন্য অপরের নিকট হাত পাতা বৈধ, কিন্তু ফক্বীরের বিষয়টি ব্যতিক্রম। ফক্বীরের জন্য সাওয়াল করা জায়েয নেই। (ফাতহুল ক্বাদীর)

৩. আমিল ঃ- যাকাতের অর্থ ব্যায়ের তৃতীয় খাত হল আমিল। 'আমিল' সাদক্বা ও উশুর আদায় করার জন্য সরকার কতৃক নিয়োজিত ব্যক্তিকে বলা হয় (কাফী)।

৪. মুআল্লিফাতুল ক্বুলুব ঃ- অর্থাৎ, যাঁদের অন্তর সমূহকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়। সাহাবায়ে কেরামের ঐক্যমত দ্বারা এই পর্যায়টি রহিত হয়ে গেছে।[১২]

৫. রেকাব:- এর অর্থ হল মুকাতাব। মুকাতাব ঐ গোলাম কে বোঝায়, যাকে তার মনিব তার আযাদের জন্য কিছু অর্থ প্রদান করার জন্য নির্দিষ্ট করেছে। বর্তমান সময়ে এটি বর্তমান নেই।

৬ গারিম:- গারিম শব্দের অর্থ হল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, যার উপর এত পরিমাণ ঋণ রয়েছে যে, ঋণ পরিশোধ করার পর যাকাতের নেসাব বাকী থাকে না। যদিও তার অন্যের নিকট পাওনা থাকে কিন্তু আদায়ে সমর্থ না থাকে।[১৩]

৭.ফি সাবিলিল্লাহ:- এর দ্বারা 'সাজ-সরঞ্জামহীন মুজাহিদ এবং দরিদ্র হাজীদের জন্য ব্যয় করা' বোঝানো হয়েছে।

৮. ইবনে সাবীল:- অর্থাৎ ঐসব মুসাফির যাদের সাথে মাল-সামগ্রী নেই। এরা যাকাত নিতে পারবে, যদিও তার ঘর মাল বর্তমান থাকে। বরং, ঐ পরিমাণ নেবে যাতে তাদের প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়।[১৪]

বিঃ দ্রঃ:- উপরিক্ত আলোচনার দ্বারা এটা সাব্যস্ত যে, বর্তমানে যাকাতের খাত হল ৭ টি (মুয়াল্লিফাতুল ক্বুলুব বাদে)। এগুলি হল যথাক্রমে - ১. ফক্বীর ২) মিসকিন ৩) আমিল ৪) রেকাব ৫) গারিম ৬) ফি সাবিলিল্লাহ ৭) ইবনে সাবিল। বর্তমানে 'রেকাব' এর অবস্থায় পাওয়া যায় না কারণ এখন দাস ও দাসী প্রথা নেই। সুতরাং এদের মুক্ত করারও অবস্থা বিদ্যমান নেই।

মাসয়ালা:— উপরের বর্ণিত গুলি হল যাকাতের অর্থ প্রদান করার খাত। তবে মালিকের জন্য ইখতিয়ার রয়েছে সে ইচ্ছা করলে তাদের প্রত্যেকে কিছু কিছু করে যাকাতের অর্থ প্রদান করতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে একই খাতেই যাকাতের সমস্ত অর্থ প্রদান করতে পারবে। (হেদায়া) অনুরূপভাবে এক ব্যক্তিকেও যাকাতের সমস্ত অর্থ প্রদান করা যায়েয রয়েছে। (ফাতহুল ক্বাদির)

মাসয়ালা:- যাকাতের অর্থ নিজের আসল তথা পিতা মাতা ও তদূর্ধ লোকেদের এবং নিজের সন্তান-সন্ততি ও তদনিম্ন লোকেদের প্রদান করা জায়েয নেই। (কাফী)

মাসয়ালা:- নিজের স্ত্রীকেও যাকাতের অর্থ প্রদান করা জায়েয নেই। (আলমগিরী)

মাসয়ালা:- যে বাড়ি বা ফ্লাট বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে তৈরী হয়নি বরং নিজের ব্যবহারের জন্য তৈরী সেক্ষেত্রে তার ভাড়ার উপর যাকাত হবে।[১৫]

মাসয়ালা:-নিকটবর্তী যাকাত প্রদেয় স্থান থাকা সত্বেও বর্ষশেষে দূরবর্তী কোন স্থানে যাকাত প্রদান করা মাকরূহ। তবে হ্যাঁ, যদি তার কোন আত্মীয় থাকে তাহলে

১১. আহকামে শরীয়াত ২য় খন্ড ১৩৯ পৃ:, ১২.ফাতওয়ায়ে আহলে সুন্নাত-কেতাবুয যাকাত ১২২পৃ: (তাফসিরে খাযাইনুল ইরফান ৩৬৯ পৃঃ), ১৩. আদ দুররে মুখতার ৩/৩৩৯, ১৪.বাহারে শরীয়াত,যাকাত অধ্যায়, মাসলা নং ১৬, ১৫. ওক্কারুল ফাতওয়া ২/৩৯১-৩৯২পৃ:।

তা বৈধ।[১৬]

মালিকে নেসাব কিন্তু তার ঋণ থাকলে হুকুম

সেক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধ করার পর যদি নেসাব না থাকে, তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে না।[১৭]

■ **নাবালিগের জমাকৃত অর্থের যাকাত কি দিতে হবে?**

নাবালিগের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়, যদিও তার নিকট নেসাব সমতুল সম্পত্তি থাকে। কারণ, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য বালিগ হওয়া হল শর্ত।

আল্লামা ইবনে আবিদিন শামী কুদ্দিসা সিররুহু লিপিবদ্ধ করেছেন, পাগল ও বাচ্চার উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। [১৮]

সাদকায়ে ওয়াজেবা ও সাদকায়ে নাফেলা

■ শরীয়তে দুই প্রকার সাদকা বিদ্যমান ঃ সাদকায়ে নাফেলা ও সাদকায়ে ওয়াজেবা। আবার দুই প্রকার সাদকার প্রদানের খাতের মধ্যেও পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে।

■ সাদকায়ে নাফেলা প্রদানের খাত সমূহ হল ঃ ফক্বীর, ধণী, সায়্যেদ ও সায়্যেদ ব্যতীত অন্যান্য, বিশেষ ও সাধারণ সকলের জন্য গ্রহণ করা বৈধ। যদিও এর অধিক হক্বদার হল ফক্বীর।

■ সাদকায়ে ওয়াজেবার খাত সমূহ ঃ

সাদকায়ে ওয়াজেবা অর্থাৎ যাকাত, ফেত্‌রা ইত্যাদি। এর প্রদানের খাত সমূহ হল ৭ টি (মুয়াল্লিফাতুল ক্বুলুব বাদে কারণ এটি রহিত হয়েছে)। এগুলি হল যথাক্রমে ঃ ১. ফক্বীর ২) মিসকিন ৩) আমিল ৪) রেকাব ৫) গারিম ৬) ফি সাবিলিল্লাহ ৭) ইবনে সাবিল। বর্তমানে 'রেকাব' এর অবস্থায় পাওয়া যায় না কারণ এখন দাস ও দাসী প্রথা নেই। সুতরাং এদের মুক্ত করারও অবস্থা বিদ্যমান নেই।

মাসয়ালা:- সাদকায়ে ওয়াজেবা ধণী, সায়্যেদ প্রমুখদের জন্য নেওয়া অবৈধ।

■ **বানী হাশিমদের যাকাত দেওয়া জায়েয নয় কেন?**

হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধরদের যাকাতের অর্থ দেওয়া যায়েয নয়, কারণ যাকাত হল লোকেদের মাল-সম্পদের. ময়লা। হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনই নিজের জন্য যাকাতের মাল ব্যবহার করেন নি, না নিজের খানদান বানী হাশিমের জন্য কখনও ব্যবহার করেছেন। বরং, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জন্য ও নিজের বংশধর বানী হাশিমদের জন্য যাকাত ও উশুরের মাল হারাম করে দেন। তবে, বানী হাশিমদের তোহফা দেওয়া বৈধ। [১৯]

উশ্‌র ও ফসলের যাকাত

জমি হতে মুনাফা হাসিলের উদ্দেশ্যে উৎপাদিত ফসলের উপর যে যাকাত আদায় করা হয় তাকে উশ্‌র বলা হয়।[২০] একে উশ্‌র বলা কারণ হল সাধারণত জমির উৎপাদিত ফসলের ১/১০ (একদশমাংশ) যাকাত স্বরূপ দেওয়ার জন্য।

মাসয়ালা:- যে সকল জমি বৃষ্টি,নদী-নালা ইত্যাদিব পানির দ্বারা বিনামূল্যে সেচনে চাষ করা হয়, সেক্ষেত্রে দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত ওয়াজিব।[২১] আর যে সকল জমি সেচনেব জন্য অর্থ দ্বারা পানি ক্রয় করা হয় সেক্ষেত্রে কুড়ি ভাগের এক ভাগ যাকাত ওয়াজিব।

কী কী ফসলের উপর উশ্‌র ওয়াজিব

শস্য:- ধান,গম,সরিষা,যব,ভুট্টা,বাজরা,আঁখ, কার্পাস ইত্যাদি সকল রকমের শস্য।

ফল:- আম,লিচু,লেবু,আঙ্গুর,বাদাম ,পেয়ারা , আপেল, বেদানা ,আনারস, নাসপাতি,আখরোট , নারকেল,তরমুজ ,খেজুর ইত্যাদি সব রকমের ফল।

শাক-সব্জী:-আলু,পেয়াঁজ,রসুন,শষা,বেগুন, করলা ,ভেন্ডি ,টমেটো,লঙ্কা ,কপি ,পালং ,ধনে ইত্যাদি সব রকমের শাক সব্জী।[২২]

মাসয়ালা:- উশ্‌র ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে কোন পরিমাপ নির্দিষ্ট নেই বরং জমি হতে যা পরিমান উৎপন্ন হবে তার উপর উশ্‌র বা অর্ধ উশ্‌র ওয়াজিব হবে।[২৩]

মাসয়ালা:- ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির উপবও উশ্‌র ওয়াজিব হবে।[২৪]

---

১৬. আলামগিরী ১/১৯০ পৃ:,দুররে মুখতার ২/৯৩-৯৪ পৃ:, ১৭. বাহারে শরীয়াত ১/ ৮৭৮ পৃঃ, ১৮. রাদ্দুল মুহতার আলা দুররে মুখতার ৩/২০৭ পৃঃ, ১৯. ফাতওয়া আলমগিরী ১/১৮৮, ২০.ফাতওয়া হিন্দিয়া-কেতাবুয যাকাত ১/১৮৫ পৃ:, ২১. সুত্র: সহী মুসলিম -কেতাবুত যাকাত হাদিস নং ৯৮১, ২২.ফাতওয়া হিন্দিয়া-কেতাবুয যাকাত ১/১৮৬ পৃ:, ২৩.ফাতওয়া হিন্দিয়া-কেতাবুয যাকাত ১খন্ড ২৪.দুররে মুখতার ৩/৩১৪ পৃ:,ফচওয়া তাতার খানিয়া ২/৩৩০ পৃ:।

ফিলিস্তিন ইজরায়েল দ্বন্দ্ব- একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

(প্রথম পর্ব) .. মহম্মদ মেহেদী হাসান জামালী

ফিলিস্তিন শব্দটা শুনলেই আমাদের মানস পটে ভেসে ওঠে একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের ক্ষেত্রভূমির চিত্র। ফিলিস্তিন শব্দটা শুনলেই আমাদের কানে আসে লক্ষ লক্ষ মজলুমের কান্নার আওয়াজ। শিশুর শৈশব, নারীর সম্ভ্রম, মানুষের মানবাধিকাব, জনতার স্বাধীনতা ভিটে মাটি কি লুণ্ঠিত হয়নি একসময় শরণার্থী হয়ে আসা ইহুদি জাতির নরখাদকদের দ্বারা। ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উপরে ইজরাইলিদের অত্যাচারের ভয়াবহতা হাজার শতাব্দীর ইতিহাসে নয়, বরং গত বছর অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর (২০২৩) - এই দুই মাসের পরিসংখ্যান দেখলেই বুঝতে পারা যায়। আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম বিশেষত আল জাজিরার রিপোর্ট অনুযায়ী কেবলমাত্র উক্ত দুই মাসে অন্তত ২৩৩৫৭ জন ফিলিস্তিনি মারা গেছে। এর মধ্যে শিশু ৯৬০০ জন ও মহিলা ৬৭৫০ জন। আহত হয়েছে শিশু ৮৬৬৩ জন ও মহিলা ৬৩২৭ জন সহ সর্বমোট ৫৯ হাজার ৪১০ জন। লক্ষাধিক বাসগৃহ, শতাধিক বিদ্যালয় দুশর কাছাকাছি এবাদত খানা ২৭ -৩৫টি হাসপাতাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ১৭ লক্ষ নাগরিক শরণার্থী শিবিরে দিন যাপনে বাধ্য হয়েছেন। সকল পরাশক্তি রাষ্ট্রগুলি ইহুদিদের সরাসরি বা মৌন সমর্থন জানিয়েছে। মানব আধিকার সংগঠনগুলির মুখে কলুপ এটেছে। অন্যায় ভাবে জোরদখল করে সমগ্র রাষ্ট্রটি কে ধ্বংস করে দেওয়া ইজরায়েলের সরকারের বিপক্ষে কেউ প্রতিবাদ করছে না। মুসলিম দেশগুলোর সংগঠন ওআইসি ও আরব লীগ নিষ্ক্রিয় নিন্দাবাদ জানিয়ে দায় সেরেছে। যেকোনো বৃহৎ ঘটনার শিকড় তার অতীতের মধ্যেই নিহিত থাকে। তাই বর্তমান সময়ে বিষয় জানতে আমাদের ইতিহাস জানা একান্ত প্রয়োজন। আমরা এই প্রবন্ধে ধারাবাহিকভাবে সেই ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করব। হাজার হাজার বছর ধরে হাজারো ঘটনার সাক্ষী মধ্যপ্রাচ্যের ছোট্ট একটা দেশ ফিলিস্তিন। আয়তনে ছোট হলেও এই দেশটির গুরুত্ব অসীম। প্রাচীন কালে শাম দেশে হিসাবে পরিচিত ভূখণ্ডটি আজ ফিলিস্তিন, সিরিয়া, জর্ড ডন ও লেবানন এই চারটি ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত।

ইতিহাসবিদদের মতে, হযরত নূহ আলাইহি সালাম এর পৌত্র কানান এর বংশধররা ছিলেন ফিলিস্তিনি সভ্যতা নির্মাতা। খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০ অব্দ থেকে লেবানন ও ভূমধ্যসাগরের মাঝামাঝি অঞ্চলে এই সভ্যতা গড়ে তারা। খ্রিস্টপূর্ব ১৩ শতকে আরব সীমান্ত অঞ্চলের বহু লোক ফিলিস্তিনে আসেন। তারাও ছিলেন কানানি আরব। তাদের অন্যতম গোত্র ছিল জেবুসি। ফিলিস্তিনে এ গোত্রের প্রথম সরদার মালিক সাদিক। তার উপাধি ছিল সালেম। তিনি জেরুসালেম (আল কুদস) নগরটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই কানানিদের হাত থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১২২০ অব্দে ইজরাইলরা ফিলিস্তিন ভূমি দখল করে নেয়। তারা এসেছিল মেসোপটেমিয়া থেকে।

ইহুদি কারা ? ঃ- বানী ইসরাইলের অর্থ ইসরাইলের বংশধব।. ইসরাইল হল হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এর অপর নাম। তার অপর এক সন্তানের নাম ছিল ইয়াহুদা, অনেকের মতে এই ইয়া হুদার বংশধররা ইহুদি। প্রকৃত অর্থে বাণী ইসরাইলের সবাই ইহুদী নন, তাদের একটা অংশ ইহুদী। হযরত ইব্রাহিম, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব, হযরত মুসা, হযরত ইউসুফ, হযরত দাউদ, হযরত সুলাইমান সহ অনেক নবী ও রাসূলগণ আলাইহিমুস সালাম- এর স্মৃতি বিজড়িত স্থান এই পূণ্যভূমি ফিলিস্তিন। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম আল আকসা মসজিদ নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম জ্বীনদের মাধ্যমে এই পবিত্র মসজিদের পুনঃনির্মাণ করেছিলেন ।

ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে এই দেশটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ফিলিস্তিনে অবস্থিত আল-আকসা মসজিদ-ই মুসলিমদের প্রথম কেবলা। পবিত্র মেরাজ রজনীতে এখানে সমবেত হয়েছিলেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম সহ সকল নবী ও রসূলগণ এবং

নামাজের ইমাম হয়েছিলেন আমাদের প্রাণ প্রিয় আকা হুজুরে আকরাম মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম। পবিত্র কোরআন পাকে মহান রাব্বুল আলামিন সেই পবিত্র রাত্রি ও বরকতম স্থানের নুরানী সফরের বর্ণনা করেছেন।

(অনুবাদ)- ''পবিত্রতা তারই জন্য, যিনি আপন বান্দাকে রাতারাতি নিয়ে গেছেন মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার আশেপাশে আমি বরকত রেখেছি, যাতে আমি তাকে মহান নিদর্শনসমূহ দেখাই; নিশ্চয়ই তিনি শোনেন, দেখেন। (১৭ঃ১)

হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলঃ- ফিলিস্তিনে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল দ্বিতীয় খলিফা হযরত ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শাসন কালে। তৎকালীন সময় সমগ্র শাম দেশে শাসন করত রোমান বাইজানটাইন সাম্রাজ্য। প্রথমদিকে তারা মুসলিমদের সাথে সুসম্পর্ক রেখে চললেও পরবর্তীতে এই সম্পর্কের অবনতি ঘটে। মুসলিম দূত কে হত্যা, খ্রিস্টান মহিলা ভন্ড নবী সাজাহ কে সহযোগিতা, সীমান্তবর্তী এলাকায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সহ একাধিক কারণে আমিরুল মোমেনীন শাম দেশে সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন।

৬৩৬ থেকে ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মুসলিম যোদ্ধাগণ বীরত্বের সাথে লড়াই করে সমগ্র শাম দেশ জয় করে নেয়। ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে হযরত আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে জেরুজালেম অবরোধ করা হয়.। মুসলিমরা চাইছিলেন রক্তপাতহীনভাবে বিজয়ী হতে। অবশেষে হযরত ওমর ফারুক এলে জেরুজালেমের অধিবাসীরা সন্ধি স্বাক্ষর করে। হযরত ওমর ফারুক শহরের খ্রিস্টানদের প্রধান সাফরোনিয়াসকে নিরাপত্তা পত্র প্রদান করেন, যা সেখানকার নাগরিকদের জান, মাল, সম্মান ধর্ম পালনের স্বাধীনতা উপসনালয় ও অর্থনৈতিক সুরক্ষা ইত্যাদি নিশ্চিত কবে।

. এরপর হযরত উমার সাখরা বা প্রস্তর টিলা ও বোরাক বাঁধার স্থানটির কাছে মসজিদ নির্মাণের আদেশ দেন। উমাইয়া শাসক আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান ৬৮৫- ৬৮৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মসজিদের সাখরা এর পুনঃনির্মাণ করেন। এবং নতুন করে মসজিদে আকসা তৈরির জন্য মসজিদে আকসার দেওয়াল ঘেরা সকল অংশ এর অন্তর্ভুক্ত করেন। পরবর্তীতে আব্বাসীয়গণ এর সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নে পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ - ১০৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৫০০ বছর মুসলমান নির্বিঘ্নে ফিলিস্তিন শাসন করেছিল। কোন রক্তপাত, উপসনালয় ধ্বংস কিংবা জাতিগত নিপীড়নের কোন ঘটনা ঘটেনি তখন। একাদশ শতকের শুরুতে পোপ ক্রুসেডের ডাক দিলে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ফলে আবার শুরু হয় রক্তক্ষয় সংঘর্ষ । যা এখনও চলছে।

---------- **(চলবে)**

মহিলা যখন একজন আদর্শ মা

পারিবারিক জীবনে পিতামাতার দায়িত্ব দ্বৈত হলেও মায়ের ভূমিকা প্রত্যক্ষ ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। মাতা একদিকে যেমন গর্ভধারীণী, স্তন্যদায়িণী অপরদিকে তেমনই সেবিকা-ধাত্রী, শিক্ষায়িত্রী এবং অভিভাবিকা।

নিঃসন্দেহে ইসলাম মাতার ভূমিকাকে এক বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেছে। এক্ষেত্রে মায়ের দায়িত্ব পালনকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি।

১) গর্ভধারণ ঃ সন্তান মাতৃগর্ভে কমবেশী দশমাস যাবৎ অবস্থান করে। এ সময় মাতাকে খুবই কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। গর্ভাবস্থায় একজন মাতাকে সদাপ্রফুল্ল ও সংচিন্তামগ্ন অবস্থায় সাংসারিক কর্ম কান্ডে লিপ্ত থাকতে হয়। তাকে খেয়াল রাখতে হয় ঐ সময় যেন কুচিন্তা-বিমর্ষতা মনের উপর ছায়াপাত করতে না পারে। সুতরাং, সে সময় ওলী আওলিয়াগণের জীবনী, চরিত্র গঠনমূলক ধর্মীয় বই পুস্তক এবং কুরআন ও হাদিসগ্রন্থ বেশী বেশী পাঠ করা আবশ্যক। কেননা, গর্ভস্ত সন্তানের উপর গর্ভধারিণী মায়ের গুন ও চরিত্রের প্রভাব অনস্বীকার্য। বাস্তবজীবনে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমরা দিতে পারি। প্রাসংগিকভাব আমরা হুযুর গাওসে আযম হযরাত আব্দুল ক্বাদির জিলানী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কথা বলতে পারি। হযরাত গাওসে পাক রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখন হুযুরের মাতা নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত সহ ইসলামী বিধি বিধান মত ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে মশগুল থাকতেন। এ কারণেই হাদীস শরীফে বলা হয়েছে- ''তোমরা যদি সন্তানকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তুলতে চাও, তাহলে শিশু জন্মের আঠার বছর পূর্বে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা কর।" অর্থাৎ তার মাকে শিক্ষিতা কর। এখানে শিক্ষা বলতে সঠিক শিক্ষা, আদর্শ শিক্ষা, দ্বীনের জ্ঞান সম্পর্কে বলা হয়েছে।

গর্ভকালীন সময়ে মাকে কতগুলো ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। যেমন, হারাম-হালালের বাছ বিচার করে হালাল ভক্ষন করা, হারাম সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা, কড়াকড়ি ভাবে পর্দা রক্ষা করে চলা, দেহ মনকে সর্বদা পূত পবিত্র রাখা প্রভৃতি। এছাড়াও এ সময়ে মায়েদের কুরআন শরীফের পাঁচটা সুরাহর তিলাওয়াত আমল করলে, বড়ই ফযীলতের বিষয় হবে বলে বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন-

১) গর্ভাবস্থায় সুরাহ ইমরান পড়লে সন্তান দ্বীনের দাঈ (প্রচারকারী) হবে।
২) সুরা মুহাম্মাদ পড়লে, বাচ্চা হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর করমে সবর বা ধৈর্য্য ধারণকারী হবে।
৩) সুরা ইউসুফ পাঠ করলে বাচ্চা সুন্দর হবে।
৪) সুরা মরিয়ম পড়লে, বাচ্চা নেককার হবে।
৫) সুরা লুকমান পাঠ করলে, বাচ্চা হিকমত ওয়ালা হবে।

শুধু উল্লেখিত পাঁচটি কেন, পবিত্র কুরআনের সম্পূর্ণটাই বরকতময়, কল্যাণময়। তাই, এ সময় বেশী বেশী কুরআন তিলওয়াত করতে থাকা কর্তব্য এবং সম্পূর্ণ কুরআনের খতম তিলওয়াত খুবই উত্তম হবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিত্‌রের নামায হল তিন রাকায়াত

ফক্বীর নুরুল আরেফিন রেজবী আযহারী

১. হযরাত আবু সালমা বিন আব্দির রহমান বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরাত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কে জিজ্ঞাসা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে কিরূপ নামায আদায় করতেন? হযরাত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইরশাদ করেন ঃ রমযান হোক কিংবা রমযান ব্যতীত অন্যকোন মাস রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগারো রাকায়াতের অধিক নামায আদায় করতেন না। হুযুর চার রাকায়াত আদায় করতেন- এর মধ্যে সৌন্দর্য্য ও দীর্ঘায়িত জিজ্ঞাসা করো না- পূণরায় চার রাকায়াত আদায় করতেন- এরও সৌন্দর্য্য ও দীর্ঘায়িত জিজ্ঞাসা করো না- পূণরায় তিন রাকায়াত আদায় করতেন। হযরাত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন ঃ আমি আরয করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি বেত্‌র আদায়ের পূর্বে আরাম করেন। হুযুর ইরশাদ করলেন ঃ হে আয়েশা! আমি চোখ বন্ধ থাকে কিন্তু অন্তর জাগ্রত থাকে। (সহীহ বুখারী ঃ১২৭; সহীহ মুসলিম ঃ ৭৩৮; সুনানে আবু দাউদ ঃ১৩৩; সুনানে তিরমীযি ঃ ৪৩৯; সুনানে নেসাঈ ১২৯৩)

২. হযরাত আবি ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন রাকায়াত বিত্‌র আদায় করতেন। প্রথম রাকায়াতে সুরা 'সাব্বিহিসমি রাব্বিকাল আ'লা' দ্বিতীয় রাকায়াতে 'ক্বুল ইয়া আইয়্যোহাল কাফিরুন' এবং তৃতীয় রাকায়াতে 'ক্বুল হুয়াল্লাহু আহাদ' আদায় করতেন। আর রুকুর পূর্বে দুয়ায়ে ক্বুনুত পাঠ করতেন এবং বিত্‌র হতে ফারিগ হয়ে তিনবার সুবহানাল মালিকিল ক্বুদ্দুস ' পাঠ করতেন। (সুনানে আবি দাউদ ঃ ১৪২৩; সুনানে নেসাঈ ঃ ১৬৯৫; সুনানে ইবনে মাযা ১১৭১)

৩. হযরাতে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন রাকায়াত বিত্‌র আদায় করতেন। প্রথম রাকায়াতে সুরা 'সাব্বিহিসমি রাব্বিকাল আ'লা' দ্বিতীয় রাকায়াতে 'ক্বুল ইয়া আইয়্যোহাল কাফিরুন' এবং তৃতীয় রাকায়াতে 'ক্বুল হুয়াল্লাহু আহাদ' আদায় করতেন। (সুনানে তিরমীযি ঃ ৪৬২; সুনানে নেসাই ১৬৯৮ ; সুনানে ইবনে মাযা ঃ ১১৭২)

৪. মোহাম্মাদ বিন আলী স্বীয় পিতা হতে এবং নিজের দাদা হতে তিনি হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, হুযুর রাত্রি বেলায় দন্ডায়মান হতেন, মেসওয়াক করতেন, পূণরায় দু'রাকায়াত নামায আদায় করতেন। পূণরায় হুযুর আরাম করতেন, পূণরায় দন্ডায়মান হতেন, মেসওয়াক করতেন, এবং দু'রাকায়াত নামায পড়েন। সর্বমোট ছয় রাকায়াত নামায আদায় করেন। পূণরায় তিন রাকায়াত বিত্‌র আদায় করতেন পরে দু'রাকায়াত নামায আদায় করতেন। (সহীহ মুসলিম ৭৬৩, সুনানে আবি দাউদ ৫৮)

৫. হযরাত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত্রি বেলা উঠে আট রাকায়াত নামায আদায় করতেন এবং পূণরায় তিন রাকায়াত বিত্‌র আদায় করতেন এবং নামাযে ফজরের পূর্বে দু'রাকায়াত নামায আদায় করতেন। (সুনানে নেসাই ঃ ১৭০৩)

৬. হযরাত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন রাকায়াত বিত্‌রের নামায আদায় করতেন। (সুনানে নেসাই ১৭০১-১৭০২)

বিতরের এক রাকায়াত দলীলের খন্ডন

■ **বাতিল ওহাবী গোত্র বিতর এক রাকায়াত হওয়ার পক্ষে যে দলীলগুলি তুলে ধরে তার মধ্যে হল ঃ**

১. হযরাত ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত যে, একজন ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলেন রাতের নামাযের ব্যাপারে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমালেন

..... **১০ পাতা দেখুন**

ইসলামের বিধানসমূহ ঃ সংজ্ঞা ও হুকুম

ফরযঃ শরীয়তের ঐ সকল বিধানসমূহ যা নাসসে ক্বাতাঈ (ক্বুরআন ও হাদিসের অকাট্য দলীল) দ্বারা সাব্যস্ত বা প্রমাণিত তাকে ফরয বলা হয়।

হুকুম ঃ ফরয হল অবশ্য করণীয়, যার মধ্যে কোন রূপ সন্দেহ নেই এবং এর অবিশ্বাস ও অস্বীকারকারী হল কাফের।

ফরয হল দু'প্রকারের ঃ

ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়া

ফরযে আইন ঃ যে সকল হুকুম প্রত্যেক সাবালক সাবালিকার জন্য পালন করা আবশ্যক। যথা ঃ পাঁচ ওয়াক্তের নামায, রমযানের রোযা ইত্যাদি।

ফরযে কিফায়া ঃ যা প্রত্যেকের পক্ষে অবশ্য পালনীয় বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে হতে কেউ পালন করলেই সকলের পক্ষে হতে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যায় তাকে ফরযে কেফায়া বলে। যথা- জানাযার নামায।

ওয়াজিব ঃ শরীয়তের ঐ সকল বিধানসমূহ যা দলীলে যান্নি (অস্পষ্ট দলীল) দ্বারা প্রমাণিত, তাকে ওয়াজিব বলে। ওয়াজিব হল অবশ্য করণীয়। যথা ঃ বিতরের নামায ও ঈদের নামায ইত্যাদি।

হুকুম ঃ কোন প্রকার ওয়াজিব একবার পরিত্যাগ করা হল গুনাহে সাগীরা কিন্তু বারংবার পরিত্যাগ করা হল গুনাহে কাবীরা।

সুন্নাত ঃ ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত ঐসকল বিধান যা হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র আমল থেকে সাব্যস্ত তাকে সুন্নাত বলা হয়।

সুন্নাত হল দু'প্রকারের ঃ

সুন্নাতে মুআক্কাদাহ ও সুন্নাতে গায়ের মুআক্কাদাহ

সুন্নাতে মুআক্কাদাহ ঃ যে সকল সুন্নাত সমূহ যা হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা করেছিলেন, এবং যেগুলি পালনের ক্ষেত্রে তা'কীদ করেছিলেন সেগুলি হল সুন্নাতে মুআক্কাদ।

হুকুম ঃ সুন্নাতে মুআক্কাদাহ আদায় না করা হল গুনাহ। আদায় করা সাওয়াবের কাজ। ছেড়ে দেওয়া হল শাস্তির কাজ বরং ছেড়ে দেওয়া অভ্যাসে পরিণত হলে আযাবের যোগ্য।

সুন্নাতে গায়ের মুআক্কাদাহ ঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ সকল সুন্নাত সমূহ শরীয়তের দৃষ্টিতে এমনই গ্রহণীয় যেগুলি ত্যাগ করা হল অপছন্দনীয় কিন্তু ঐ পর্যায়ের নয় যে ত্যাগ করলে আযাবের হক্বদার হবে। ঐ সকল কর্ম সমূহ হুযুর সর্বদা করেন নি।

হুকুম ঃ এই সকল আমলসমূহ আদায় করা হল সাওয়াবের কাজ এবং আদায় না করা যদিও তা অভ্যাসগত হয়, তাহলে গুনাহ নয়।

যেমন ঃ আসর ও ইশার ফরয নামাযের পূর্বে চার রাকায়াত সুন্নাত নামায পড়া।

নফল ও মুস্তাহাব

ঐ সকল পবিত্র কর্মসমূহ যা শরীয়তের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় কিন্তু ছেড়ে দেওয়া অপছন্দ নয়। যদিও হুযুর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে রসুল (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) উক্ত কর্মসমূহ করেছিলেন কিংবা করার ব্যাপারে ইরশাদ করেছিলেন।

হুকুম ঃ এগুলি করা হল সাওয়াব এবং না করলে কোনরূপ গুনাহ নেই।

মুবাহ ঃ যে সকল কার্যাদি সমন্ধে শরীয়তে কোন আদেশ বা নিষেধ নেই এবং যা করায় সাওয়াব হয় না ও গুনাহও হয় না তাকে মুবাহ বলা হয়। যেমন ঃ পান খাওয়া, ঘড়ি পরিধান করা।

হালাল ঃ যে সকল জিনিস বা খাদ্য-পানীয় সম্পর্কে ক্বুরআন ও হাদীসে সরাসরি বৈধ বলা হয়েছে বা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবৈধ ঘোষিত হয়নি, তাকে 'হালাল' বলে। যেমন ঃ ব্যবসা করা।

হারাম ঃ যে সকল বিষয় অকাট্য প্রমাণ দ্বারা নিষিদ্ধ বলে প্রমাণিত তাকে হারাম বলে।

হুকুম ঃ হারামে লিপ্ত হওয়া হল কবীরা গুণাহ। এগুলি থেকে বেঁচে থাকা হল ফরয।

যেমন ঃ মিথ্যাচার, সুদ খাওয়া, ব্যভীচার, চুরি করা, মদ্যপান করা,শুকরের মাংস ভক্ষণ করা।

..... **১২ পাতা দেখুন**

ভারতীয় মুসলমানদের ৭৫ বছরের নির্যাতিত সফর

(মাহানামা আলা হযরাত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর সংখ্যা হতে সংগৃহিত)

এই প্রবন্ধটি লেখার সময়কালে একটি ভয়াবহ ফ্যাসাদ চক্ষুকে চড়কগাছে তুলেছে। সেটি হল, ভারতের মনিপুর রাজ্যের বাসিন্দাদের উপর অকথ্য অত্যাচার। আর যার ভয়াবহতার সকল ফুটেজ সোশাল মিড়িয়ায় ছড়াছড়ি। যাইহোক, এ সম্পর্কে আলোকপাত বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বরং, অসহায় ভারতীয় মুসলমানরা কিভাবে যুগে যুগে নির্যাতিত হয়ে আসছে তার একটি কালচিত্র তুলে ধরা হল আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ভেবেন্ডী নির্যাতন

স্থান ঃ ভেবেন্ডী ; মহারাষ্ট্র
সময়কাল ঃ ৭ ও ৮ মে ১৯৭০ সন।
হিন্দু বসবাস ঃ ৪৪ শতাংশ
মুসলিম বসবাস ঃ ৫১ শতাংশ।
তৎকালিন মুখ্যমন্ত্রী ঃ বেসান্ত রাও পি. নায়েক
শাসক দল ঃ কংগ্রেস

১৯৭০ সালে মহারাষ্ট্রের ভেবেন্ডী, জলগাঁও ও মহার এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে।

দাঙ্গার কারণ ঃ অজানা কোন পত্র দ্বারা হিন্দু নেতাদের বলা হয়, ১৯৬৯ সালে আমেদাবাদ দাঙ্গার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মুসলিম সমাজ সোচ্চার ও সংঘটিত হচ্ছে। প্রেস মারফৎ উক্ত পত্র ছাপিয়ে ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় বন্টন করা হয়। তাছাড়া, কিছু হিন্দু পন্ডিতদের মুসলমান বিরোধী উষ্কানীমূলক বক্তব্য আন্দোলনের গতিকে আর ত্বরান্বিত করেদেয়। উল্লেখ্য, উক্ত বছরে মহরম ও হোলি একই দিনে হওয়ায় পরিস্থিতি চলে যায় আয়ত্ত্বের বাইরে। একটি মিছিল ভেবেন্ডীর বড় মাসজিদের রাস্তায় চালিয়ে দেয়া হয়। মুসলমানদের বারণ সত্ত্বেও কোনরূপ কর্ণপাত করা হয়নি। দেয়া হয়। মুসলমানদের বারণ সত্ত্বেও কোনরূপ কর্ণপাত করা হয়নি। সাথে সাথে রামমুহিম অঞ্চল হতে ৩-৪ হাজার লাঠিয়ালদের পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাদের এরূপ আচরণের ক্ষুব্ধ হয়ে কয়েকজন মুসলিম যুবক মিছিলের উপর পাথর বর্ষণ শুরু করে। নিমিষের মধ্যেই আন্দোলনের রোষ বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ভেবেন্ডীর পরে পরেই এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা জলগাঁওতেও ছড়িয়ে পরে।

ক্ষয়ক্ষতি ঃ সম্মিলিতভাবে জাস্টিস ডি.পি. ম্যাডান (কমিশন অফ ইনকোয়ারী) -এর রিপোর্ট অনুযায়ী আন্দোলনের ভয়াবহতায় ১৬৪ জন মারা যায়। যার মধ্যে ১৪২ জন ছিল মুসলিম ও ২০ জন হিন্দু। উক্ত পরিসংখ্যান শুধুমাত্র ভেবেন্ডী অঞ্চলের। খোনি ও নাগুন এলাকার রিপোর্ট অনুযায়ী মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৭৮। যারমধ্যে শুধু মুসলমানই ছিল ৫০ জন।

মুরাদাবাদে নির্যাতন

সময় ঃ ১৩ ও ১৪ আগষ্ট ১৯৮০
স্থান-মুরাদাবাদ, উত্তর প্রদেশ।
২০০১ সালে আদমসুমারী অনুযায়ী ঃ ৫০ শতাংশ মুসলমান এবং ৪৯ শতাংশ মুসলমান।
উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ঃ ভি.পি সিং, কংগ্রেস পার্টি।

মুরাদাবাদ (উত্তর প্রদেশ)ঃ ১৩ ই আগষ্ট ১৯৮০,সেই সময় অধিকাংশ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় মুসললিম উৎসব ঈদুল ফিত্‌র উদ্‌যাপিত হচ্ছিল। উক্ত দিনের মুসলমানদের উপর ভয়াবহ নির্যাতন ইতিহাস পৃষ্ঠাতে এক কালো অধ্যায়ের সূচনা করে। ঘটনার সূত্রপাত হল, মুসলমান আবাদীর প্রসার ও তাদের সচ্ছলতা হিন্দু সমাজের মধ্যে একটি চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৩ আগষ্টের দিন মুসলমানেরা যখন ঈদের নামায আদায় করার জন্য ঈদগাহে উপস্থিত হয় তখন একটি শুয়োর ঈদগাহে প্রবেশ করে। এ বিষয়ে পুলিশ যখন বিষয়টি এড়িয়ে যায় তখন মুসলমানদের ধারণা হয়, পুলিশ যেন জেনে বুঝে ঈদগাহে শূয়োর প্রবেশ করিয়েছে। উক্ত সময় পুলিশের ভ্যান লক্ষ্য করে পাথর বষর্ণ শুরু হয়। এর প্রত্যাঘাত স্বরূপ পুলিশ গুলিবর্ষণ শুরু করে যার ফলে ঈদের নামাযরত অনেক মুসলমান মৃত্যু রবণ করে।

তাছাড়া বহু মানুষকে নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা হয়, যার মধ্যে শিশু বয়স্কও বিদ্যমান ছিল। উল্লেখ্য, তারা কেউ আর পরে বাড়ি ফেরেনি। উক্ত রাতে মুসলমানদের একটি দল পুলিশ থানায় গিয়ে হামলা শুরু করে যাব ফলে দু'জন কনষ্টেবল প্রান হারায় এবং থানাতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

১৪ ই আগষ্ট একটি মিথ্যা কথা প্রচার করা হয় যে, মুসলমানরা একটি সম্পূর্ণ পুলিশ ক্যাম্পে হামলা করে দিয়েছে। পুলিশ বিভাগের বি.এ.সি এর প্রতিবাদ স্বরূপ দশজন মুসলমানকে নির্বিচারে শহীদ করে দেয়। ১৩ আগষ্ট থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উক্ত স্পর্শকাতর এলাকায় কার্ফু ঘোষণা করা হয়। শুরু হয় এলাকা চিহ্নিত করে নির্মম অত্যাচার। এই অত্যাচারে শহীদ হওয়া সঠিক মুসলমানদের সংখ্যা কত তা আজই ধোঁয়াশা। তবে, একটি প্রেস মিটিংয়ে দ্বারা সরকারীভাবে ৪০০ বলে ঘোষণা করা হয়। একটি মুসলমান সংগঠন শহীদের সংখ্যা ২৫০০ বলে ঘোষণা করে। যদিও আর একটি সংগঠন এই সংখ্যা ১৫০০-২০০০ বলে ঘোষণা করে।. অক্টোবরের শেষের দিকে অতিরিক্ত বিভৎসতা লক্ষ্য করা যায়। যার দ্বারা ১৪ জন মুসলমান শহীদ হয়ে যায়। এই চড়াই উতারাই এর মধ্যে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধি মুসলমানদের সান্তনা দিতে অক্টোবরে মুসলমান বসতিতে সফর করে।

মুরাদাবাদের নির্যাতনের আগুণ তখনও সম্পূর্ণ নিভেনি ইতিমধ্যে এলাহাবাদের মধ্যে পি.এস.সি ও মুসলমানদের মধ্যে হিংসার আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে। যার ফলে প্রায় ১০ জন প্রাণ হারায়।

(রিপোর্ট ঃ গান্ধি ১৯৮০, ইন্ডিয়া টু ডে ৩০-১১-৮০)

গোধরা নির্যাতন

সময় ঃ অক্টোবর, ১৯৮১

স্থান-গোধরা, গুজরাত

গুজরাতের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ঃ মাধু সিং সুলংকী,

কংগ্রেস পার্টি ।

গুজরাতের গোধরা শহরে একটি সাম্প্রদায়িক হিংসার সিলসিলা যা প্রায় একবছর ধরে চলেছিল। যে হিংসালীলা সিন্ধি ঘাঞ্চুয়া (মুসলমানদের দু'টিগোত্র) লোকেদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দে লিপ্ত হওয়ার কারণে ঘটেছিল।

প্রথম ঘটনা ২৯ শে অক্টোবর ১৯৮০ সালে ঘটেছিল যখন সিন্ধি ও ঘাঞ্চু সম্প্রদায় রাস্তার মধ্যে গাড়ির রাখাকে কেন্দ্র করে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিল। সিন্ধি ও ঘাঞ্চু সম্প্রদায় পারস্পরিক জমায়েত খুব দ্রুততার সঙ্গে হয়েছিল। প্রত্যেকে অপরের দোকান মাকানে অগ্নিপাত ঘটিয়েছিল। পাঁচটি সিন্ধি পরিবারকে সম্পূর্ণরূপে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ অতিরিক্ত হয়,. যখন মিউনিসিপ্যালিটি কতৃপক্ষ সিন্ধি সম্প্রদায়ের ধ্বংসকৃত দোকান সমূহ পূর্ণনির্মানের অনুমতি দেয়। প্রকৃতপক্ষে গোপনীয়ভাবে মুসলমানদের পূর্ণনিমানের অনুমতিকে অস্বীকার করা হয়। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ধস্তাধস্তি চলতে থাকে। এরফলে, প্রায় দশজন মারা যায়।

(রিপোর্ট ঃ ইঞ্জিনিয়ার,১৯৮৪ ২৪৬-২৬১পৃঃ)

---------- **(চলবে)**

طرق إثبات الهلال

مصنف: اعلیٰ حضرت امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن

হেলাল সাব্যস্ত হওয়ার পদ্ধতি

মূল ঃ ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরাত রাদিয়াল্লাহু আনহু

অনুবাদ ঃ ফক্বীর নুরুল আরেফিন রেজবী

■ **মাসয়ালা:-** (গুজরাত বরোদা হতে বড় নবাব সাহেব প্রেরণ করেছেন, নবাব সাইয়্যেদ মইনুদ্দিন হাসান খান বাহাদুর ২৫ মহরম ১৩২০ হিজরী।)

কি ফরমাচ্ছেন, ওলামায়ে কেরাম দ্বীনি এ মাসলার ব্যাপারে যে, রু'ইয়াতে হেলাল (প্রথম রাত্রের চাঁদ) শরীয়তের দৃষ্টিতে কি ভাবে প্রমাণিত হয়? হাওয়ালার সহিত উর্দু ভাষায় উত্তর প্রদত্ত হোক। (বায়ান করুন, সওয়াবের অধিকারী হন)

উত্তর ঃ- রু'ইয়াতে হেলালের প্রমাণের জন্য প্রথমে সাতটি পদ্ধতি রয়েছে।

■ **প্রথম পদ্ধতিঃ**

■ **নিজেই রু'ইয়াতের স্বাক্ষ্য হওয়া ঃ** অর্থাৎ, চাঁদ দর্শনকারীর(নিজের) স্বাক্ষ্য। রমযান শরীফের হেলালের জন্য একজন মুসলমান বিবেকবান, বালেগ, ফাসিক নয় এমন ব্যক্তির স্বতন্ত্র বর্ণনা এরূপ যথেষ্ট যে, ''আমি এই রমযান শরীফের হেলাল অমুকদিন সন্ধ্যায় দেখেছি।'' যদিও সে মহিলা হয়, যার অবস্থা অপ্রকাশ্য, যার বাতিনী ন্যায় পরায়নতা অজ্ঞাত, প্রকাশ্য অবস্থায় শরীয়তের পাবন্দ থাকে। যদিও তার এ বর্ণনা কাজার মাজলিসে না হয়, যদিও '' স্বাক্ষ্য দিচ্ছি'' না বলে, না দেখার পরিস্থিত বর্ণনা করে - কোথা হতে দেখেছে, কোথায় ছিল,কত উচুঁ ছিল? প্রভৃতি। এটা এ অবস্থায় যে, ঊনত্রিশ শা'বান মাতলা' (চন্দ্র উদয়ের স্থান) পরিষ্কার না থাকে, চাঁদ উদয়ের স্থান ঢাকা কিংবা মেঘাচ্ছন্ন হয়। আর পরিষ্কার মাতলা' থাকা অবস্থায় অনুরূপ ব্যক্তি জঙ্গল থেকে আসে কিংবা উচ্চ স্থানে ছিল, তাহলে একজনার বর্ণনাই যথেষ্ট হয়ে যাবে। নতুবা, দেখবে যে, সেখানকার মুসলমান চাঁদ দেখার চেষ্টা রাখে। অধিকাংশ লোক সচেষ্ট থাকে কিংবা অলস (চাঁদ) দর্শনের ব্যাপারে বেপরোয়া। বেপরোয়া অবস্থায় কমপক্ষে দু'জনের প্রয়োজন। যদিও গোপন অবস্থাসম্পন্ন হয়, নয়তো একটি বৃহৎ জামায়াত প্রয়োজন যারা স্বচক্ষে চাঁদ দেখার কথা বর্ণনা করবে। যাদের বর্ণনায় খুব ধারণা হাসিল হয়ে যাবে যে,অবশ্যই চাঁদ হয়েছে, যদিও গোলাম কিংবা প্রকাশ্য ফাসিক হয়। আর যদি, অতিরিক্ত তাওয়াতুরের গন্ডিতে পৌছাঁবে যে, বিবেক এত ব্যক্তির মিথ্যা খবর হওয়া সম্পর্কে অসম্ভব জ্ঞাত করে। এরূপ খবর মুসলমান ও কাফের সকলের জন্য গ্রহণীয়। অবশিষ্ট এগারো মাসের হেলালের ব্যাপারে সাধারণত প্রত্যেক অবস্থাতে জরুরী যে, দুইজন ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তি কিংবা একজন ন্যায় পরায়ণ পুরুষ ও দু'জন ন্যায়পরায়ণ স্বাধীন মহিলা,যার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা সম্পর্কে (সকলে) জ্ঞাত যে, শরীয়তের পাবন্দী অবস্থায় শরীয়তের কাজীর নিকট হাজির হয়ে 'আশ্হাদু' স্বাক্ষ্য দেয় । অর্থাৎ, আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি এ মাসের হেলাল অমুক দিনের সন্ধ্যায় দেখেছি আর যেখানে শরীয়তী কাজী না থাকে মুফতীয়ে ইসলাম তার স্থলাভিক্ত হবে। যখন (তিনি) সমস্ত শহরবাসীর তুলনায় অধিক জ্ঞাত হবেন,তার সম্মুখে স্বাক্ষ্য দিবে। আর যেখানে কাজী ও মুফতী কেউই না থাকে,তাহলে মজবুরির জন্য মুসলমানের সম্মুখে এক ন্যায় পরায়ন দু'জন ব্যক্তি কিংবা একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ও দু'জন ন্যায় পরায়ণ মহিলার বায়ান 'আশহাদু' শব্দের সহিতও যথেষ্ট মানা যাবে।

উক্ত এগারো মাসের হেলালের জন্য সর্বদা এ হুকুম হবে। কিন্তু ইদাইনে যদি মাতলা' পরিষ্কার থাকে আর মুসলমান রু'ইয়াতে হেলালের ব্যাপারে অলসতা না করে। আর সেই দু'জন স্বাক্ষী জঙ্গল কিংবা উঁচুস্থান

হতে না আসে,তাহলে এমতাবস্থায় ওই বৃহৎ জা'মায়াতের প্রয়োজন রয়েছে। এরূপ যেখানে এবং কোন চাঁদ যেমন মুহার্‌রমে সাধারণ মুসলমান সম্পূর্ণ যত্ন নিতে থাকে, তাহলে মাতলা' পরিষ্কার থাকা অবস্থায় , দু'জন স্বাক্ষ্য জঙ্গল কিংবা উচ্চ স্থান হতে না আসে,তাহলে প্রকৃতই বৃহৎ জামায়াতই প্রয়োজন রয়েছে। যেভাবে রমযানের প্রমাণের ও ইদাইনের ক্ষেত্রে করা হয়েছিল, এখানে তা প্রযোজ্য হবে।

দুর্‌রে মুখতারে বিদ্যমান- অর্থঃ আকাশ মেঘলা অবস্থায় রমযানের হেলালের জন্য একজন ন্যায় পরায়ণ ও অজ্ঞাত পরিচয় সম্পন্ন ব্যক্তি খবর যথেষ্ট, যদিও গোলাম কিংবা মহিলা হয় ,তাহলে রু'ইয়াতে অবস্থা বর্ণনা করে কিংবা না করে, দাবী কিংবা 'আশহাদু ' শব্দ কিংবা হুকুম কিংবা কাজীর মাজলিস ইত্যাদির কোন শর্ত নেই। কিন্তু ফাসিকের বর্ণনা ঐক্যমতে অগ্রহণীয়। আর ঈদের জন্য মাতলা' অপরিষ্কার অবস্থায় ন্যায় পরায়নের বিশিষ্ট দু'জন পুরুষ কিংবা একজন্য পুরুষ দু'জন মহিলার স্বাক্ষ্য 'আশ্‌হাদু' শব্দের সহিত হল জরুরী। আর যদি এরূপ শহরে বর্তমান যেখানে কোন ইসলামী হাকীম নেই। তাহলে, প্রয়োজন অনুযায়ী মেঘলা অবস্থায় একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির বর্ণনার উপর নির্ভরকরে রোযা রাখবে, আর দু'জন ন্যায় পরায়নের খবরে ঈদ করবে। আর যখন মেঘলা থাকবে না তখন এরূপ বৃহৎ জামায়াতের খবর গ্রহণীয় হবে যার দ্বারা দৃঢ় ধারণা হাসিল হবে। এবং ইমাম (ইমামে আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, দু'জন স্বাক্ষ্য যথেষ্ট। আর এটি. ''বাহরে রায়ক'' পছন্দ করেছেন। 'কিতাবুল আক্বদিয়ার' মধ্যে ফরমিয়েছেন ঃ ''সঠিক হল এটা যে, একজনাই যথেষ্ট । যদি জঙ্গল হতে আসে কিংবা উচ্চু স্থানে ছিল। '' আর এটি ইমাম জাহিরুদ্দিনও গ্রহণ করেছেন। আর জিলহজ্ব ও বাকী নয় মাসের চাঁদের জন্য অনুরূপই হুকুম যেরূপ ইদুল ফিতরের হেলালের ক্ষেত্রে।...(সংক্ষিপ্তকরণ)

রাদ্দুল মুহতারে বিদ্যমান- অর্থঃ যখন আসমান পরিষ্কার থাকবে, তখন রোযার হেলাল এবং ঈদের হেলালের প্রমানের জন্য বৃহৎ জামায়াতের খবর জরুরী। এ জন্যই বৃহৎ জামায়াত যে, তারা চাঁদ দেখতে ব্যস্ত ছিল। এদের মধ্যে শুধু দু-একজন ব্যাক্তির নজরে আসা; বাস্তবিক মাতলা' পরিষ্কার ছিল, সেই দু -এক জনের ভুল প্রকাশ্য। অনুরূপ বাহরুর রায়েকে বর্তমান রয়েছে। আর বৃহৎ জামায়াতের জন্য ন্যয়পরায়ণতার শর্ত নেই। অনূরুপ 'ইমদাদুল ফাতাহ' মধ্যে রয়েছে। না স্বাধীন হওয়া শর্ত রয়েছে। এরূপই 'কুহুস্তানি' তে এসেছে আর 'বাহরুর রাইক' এ বর্ণিত হয়েছে যে, যখন লোকেরা চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে অলসতা করবে,তখন উক্ত রু'ইয়াতের উপর আমল যদিও দুই স্বাক্ষ্য যথেষ্ট। কারণ এখন আর সে কারণ নেই যে সকলে চাঁদ দেখতে মশগুল ছিল। আর মাতলা' পরিষ্কার ছিল, তখন শুধু উক্ত দুই জনের নজরে আসা হল ক্বীয়াস হতে দূরীভূত। 'ওয়াল ওয়াজিয়া' ও 'জাহিরীয়া' হতে প্রকাশ্য যে, 'জাহিরী রেওয়াতে শুধু অতিরিক্ত স্বাক্ষী হওয়া শর্ত। আর অধিক দু'জনেও হয়ে যায়। (সমাপ্ত)

আর আমাদের জামানায় লোকেদের অলসতার চক্ষু দেখেছি, তাহলে দুই স্বাক্ষীর জন্য এরূপ বলবে না যে,জমহুরের খেলাফ তাদেব কিরূপ নজরে এল। যার দ্বারা স্বাক্ষীর ত্রুটি প্রকাশ হবে। তাহলে জাহিরু' রেওয়ার অবস্থা রইল না। তাহলে উক্ত ২য় রেওয়াতের উপর ফাতওয়া দেওয়া লাযিম হল। আর 'কাফী হাকিম' এর মধ্যে ইমাম মুহাম্মাদের সকল কালাম কুতুবে জাহিরু'রেওয়ার একত্রিত করা হয়েছে। এরুপ যে, রমযানের মধ্যে একজন মুসলমান পুরুষ কিংবা মহিলা, ন্যায় পরায়ণ কিংবা অজ্ঞাত অবস্থা সম্পন্ন-এর স্বাক্ষ্য গ্রহনযোগ্য। যখন সে স্বাক্ষ্য দেবে যে,সে জঙ্গলে দেখেছে কিংবা শহরে দেখেছে। আর কোন কারণ এরূপ ছিল, যার জন্য অপরদের নজরে আসেনি। ..(সমাপ্ত)

আর উক্ত দুই রেওয়াতের মধ্যে বৈপরীত্য নেই। এজন্য যে,বৃহৎ জামায়াতের শর্ত সেখানে রয়েছে যে, স্বাক্ষ্য শহরে অনুচ্চ স্থানে. হলে, তাহলে পরের বর্ণনা উক্ত পূর্বের অনির্দিষ্ট বর্ণনার নির্দিষ্টতা বর্ণনা করবে। এর উপর দলীল হল য়ে, প্রথমে এক জনের স্বাক্ষ্য না মানার কারণ এটা বলা হয়েছিল যে, একাকী তার দেখা ভুল হওয়া প্রকাশ্য। আর পরের অবস্থায় অর্থাৎ যখন জঙ্গলের মধ্যে কিংবা উচ্চস্থানে ছিল তা প্রত্যাখানের কারণ পাওয়া

যায় নি। এজন্য 'মুহিত'-এ বিদ্যমান যে, এমতাবস্থায় তার একাকী দেখা প্রকাশ্য খেলাফ হবে না। আর বাকী ন মাসের মধ্যে গ্রহন হবে না কিন্তু স্বাক্ষ্য দু'জন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ দু'জন মহিলা ন্যায় পরায়ণ স্বাধীনের যার উপর যেনার আরোপ লাগেনি যেরূপ বাকী অন্যান্য কর্মসমূহে। অনূরুপ 'বাহরুর রায়েক' এর মধ্যে ইমাম ইসবিজানী'র 'শারহ্ মুখতাসার ত্বাহাবী' হতে রয়েছে। আর প্রকাশ্য হল এটা যে, উক্ত নয় (মাসের) চাঁদের মধ্যে পরিষ্কার কিংবা অপরিষ্কার মাতলা' র কোন পাথর্ক্য নেই। প্রত্যেক অবস্থাতে দু'জনের স্বাক্ষ্য গ্রহন করা হবে। ঐ কারণ যা সেখানে বৃহৎ জামায়াতের জন্য যে শর্ত ছিল ঃ সকলে হেলাল খুঁজতে থাকবে এখানে বর্তমান নেই যে, সেই ন'মাসের চাঁদ সাধারণ লোকেরা না খুঁজতে থাকে আর এর সমর্থন করে। ইমাম ইসজিবানী'র এরূপ বলা যে, তার মধ্যে সেটি প্রয়োজন যা অন্যান্য সকল মামলার ক্ষেত্রে।

''হাদিক্বাতুল নেদায়া'' মধ্যে বিদ্যমান- যখন যামানা এমন সুলতান হতে খালি হবে যিনি শরীয়তে মামলার ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবেন, তখন শরীয়তের সকল কর্মের দায়িত্ব উলামাদের উপর ন্যস্ত হবে এবং (সে সময়) মুসলমানের উপর লাযিম হবে নিজেদের সকল শরীয়তের মামলায় তাদের দিকে প্রত্যাগমন করা। সেই ওলামারায় কাজী ও হাকীম জ্ঞাত হবেন (স্থলাভিষিক্ত হবেন)। পূণরায় যদি মুসলমানদের একজন আলেমের উপর ঐক্যমত সম্ভবপর না হয়, তাহলে প্রতিটি জেলায় লোকেরা নিজেদের ওলামাদের অনুসরন করবে। যদি জেলায় অধিক ওলামা থাকে,তাহলেযিনি আহকামে শরীয়তের অধিক জ্ঞান সম্পন্ন হবেন , তার আনুগত্য করতে হবে.। আবার যদি ইলমের দিক দিযে (সকলে) সমজ্ঞান সম্পন্ন হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে কুরআ' করে নেবে। (আল হাদিক্বাতুল নাদিয়া ১/৩৫১ পৃঃ)

■ **২য় পদ্ধতি**

■ **সাক্ষ্যর উপর সাক্ষ্য ঃ** অর্থাৎ, সাক্ষী দাতারা নিজেরা চাঁদ দেখেনি বরং, দর্শনকারীরা তাদের সামনে সাক্ষ্য প্রদান করেছে। আর নিজেদের সাক্ষীর উপর তাদেরকে সাক্ষ্য করেছে। এবং তারা উক্ত সাক্ষ্যর সাক্ষী দিয়েছে। এটা হল, যেখানে আসল সাক্ষী উপস্থিত হতে অপারগ হবে। আর এর নিয়ম হল এরূপ যে মূল সাক্ষী সাক্ষীকে বলবে, আমার এই সাক্ষ্যর উপর সাক্ষী হয়ে যাও ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি , আমি অমুক মাসের, অমুক সালের, অমুকের চাঁদ,অমুক দিনের সন্ধ্যায় দেখেছি। গৌন সাক্ষী (যাকে সাক্ষ্য বানানো হয়েছে) এখানে এসে এরূপ সাক্ষ্য দেবেঃ আমি সাক্ষ্যি দিচ্ছি , অমুকের পুত্র অমুক আমাকে তার সাক্ষীর উপর সাক্ষ্য করেছে যে,অমুক ইবনে অমুক, যে অমুক মাসের অমুক সালের অমুকের চাঁদ , অমুক দিনের সন্ধ্যায় দেখেছে। আর অমুক ইবনে অমুক উল্লেখিত ব্যক্তি আমাকে বলেছে যে, ''আমার এই সাক্ষ্যর উপর সাক্ষ্য হয়ে যাও।''

পূণরায়,প্রকৃত সাক্ষীর রু'ইয়াতের. মধ্যে পরিবর্তিত অবস্থার জন্য যে আহকাম রয়েছে, সেগুলির প্রতি. খেয়াল রাখা হল জরুরী। যেমন রমযান মাসে মাতলা' পরিষ্কার ছিল, তখন যেন শুধুমাত্র একজন সাক্ষী'র শোনা না হয় , যতক্ষণ পর্যন্ত জঙ্গল কিংবা উচ্চুস্থান হতে দেখার না বর্ণনা করে। নতুবা একজনার শাহাদাত এবং তার শাহাদাতের উপরও একজন সাক্ষী , যদিও মহিলা অজ্ঞাত পরিচয় সম্পন্না হয়, যথেষ্ট হবে। আর অন্যান্য মাসে এটা সর্বদা জরুরী যে, প্রতিজন সাক্ষীর সাক্ষ্যর উপর দু'জন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ দু'জন মহিলা ন্যয়পরায়ণ সাক্ষ্য হবে। যদিও উক্ত দু'জন পুরুষ উক্ত দু'জন আসলের মধ্যে প্রত্যেকের সাক্ষী হবে। যেমন যেখানে ঈদাইনে শুধু দু'জনের সাক্ষ্য গ্রহনীয়, যায়েদ,উমার- দু'জন ন্যায় পরায়ণ চাঁদ দেখেছে এবং প্রত্যেকে নিজেদেব. শাহাদাতের উপর বকর ও খালিদ-দু'জন পুরুষ ন্যায় পরায়ণ কে সাক্ষ্য করে দিয়েছে যে,এখানে এসে বকর ও খালিদ প্রত্যেকে যায়েদ ও উমার উভয়ের সাক্ষীর উপর সাক্ষ্য দিলে যথেষ্ট হবে। এটা জরুরী নয় যে, প্রত্যেক সাক্ষীর পৃথক পৃথকদু'জন সাক্ষ্য হবে। আর এটাও জায়েয যে, আসল (ব্যক্তি) নিজে এসে সাক্ষ্য দেবে এবং দ্বিতীয় সাক্ষ্য নিজের সাক্ষীর উপর দু'জন সাক্ষ্য পৃথক পৃথক করে পাঠাবে। হ্যাঁ, এটা জায়েয নয় যে,একজন প্রকৃতর সাক্ষ্য দু'জন সাক্ষ্য হবে, আর তাদের তাদের দু'জনার মধ্যে একজন নিজেই স্বয়ং নিজের শাহাদাত দেবে।

''**দুররে মুখতার**'' এ বিদ্যমান-সাক্ষীর উপর সাক্ষী হল গ্রহণযোগ্য। যদিও একের পর এক কতই না পর্যায়ে পৌঁছায়। যেমন, আসল সাক্ষীদ্বয় যায়েদ ও আমর কে সাক্ষ্য বানালো। তারা নিজেদের এই ''শাহাদাত আলাশ শাহাদার'' উপর বকর খালিদ কে সাক্ষ্য করে দিল। খালিদ নিজের উক্ত শাহাদাত আলাশ শাহাদাত-এর উপর সাঈদ,হামিদ কে সাক্ষ্য বানিয়ে নিল। অনূরূপ ক্বীয়াস হবে। আর মাযহাবে সহীহর উপর এই সীমাবদ্ধ হুকুম ও বদলা ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে জায়েয রায়ছে। এই শর্ত হতে যে,যে সময় কাজীর উপস্থিতি শাহাদাতের আদায় হয়,সেই সময় সেখানে প্রকৃত সাক্ষ্যর আসা, অসুস্থ কিংবা সফরে কিংবা পর্দাশালিনী রমনী হওয়ার জন্য অসম্ভব হয়। ইমাম আবু ইউসুফ (রাদিয়াল্লাহু আনহুর) এর নিকট তিন মানযিল দূরত্ব হওয়া প্রয়োজন নয়। বরং, এতটা দূরুত্ব হওয়া যথেষ্ট যে,সাক্ষী দিয়ে রাত্রীবেলায় নিজের ঘর না পৌঁছাতে পারে। অধিকসংখ্যক মাশায়েখ এই কওলটি (মত) গ্রহন করেছেন। আর কুহুস্তানী ও সিরাজিয়া'র মধ্যে রয়েছে যে এরূ উপর ফাতওয়া রয়েছে। লেখক এটিকে গ্রহনীয় রেখেছেন। আর মহিলাদের পর্দাশালিনী হল য়ে,পুরুষদের জমায়েত হতে বেচেঁ থাকবে, যদিও নিজের প্রয়োজনের জন্য বাইরে বের হয় কিংবা গোসল খানা যায়। অনূরূপ 'কুনিয়া'তে বর্তমান রয়েছে। আর এটাও হল শর্ত যে.প্রত্যেক প্রকৃত সাক্ষী যদিও মহিলাদের সাক্ষ্যর ব্যাপারে পূরো শাহাদাতের নেসাব অর্থাৎ,দু'জন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ দু'জন মহিলা সাক্ষ্য দেবে। হ্যাঁ,এটা জরুরী নয় যে,প্রত্যেক আসল সাক্ষী র দুইজন পৃথক পৃথক সাক্ষ্য হবে। আর এর অবস্থা হল,আসল সাক্ষী গৌণ সাক্ষীকে যদিও তার পুত্র হয় সম্বোধন করে বলবে ঃ ''তুই আমার এই সাক্ষ্যর উপর সাক্ষী হয়ে যা যে, আমি এই সাক্ষ্য দিচ্ছি '' আর গৌণ সাক্ষী এরূপ শাহাদাত আদায় করবে যে, ''আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অমুক আমাকে নিজের উক্ত সাক্ষীর উপর সাক্ষ্য করছে এবং আমাকে বলেছে যে,আমার এই সাক্ষীর উপর সাক্ষী হয়ে যাও''। ..(সংক্ষিপ্ত)

তারই বর্ণনায় হেলালে রমযানের মধ্যে এসেছে - ''একজনার সাক্ষী অপর জনার উপর । যেমন গোলাম কিংবা মহিলার শাহাদাত,যদিও নিজের ন্যয় (ব্যক্তির) উপর হেলালে রমযানের জন্য গ্রহণযোগ্য, যখন একজনার সাক্ষ্য সেখানে শোনার যোগ্য হবে, যেরূপভাবে অপরিষ্কার মাতলা' অবস্থায়।''

রাদ্দুল মুহতারে এসেছে ঃ যদি দু'জন সাক্ষ্য এক জন পুরুষের শাহাদাতের উপর শাহাদাত দেয় এবং তম্মধ্যে একজন নিজেই নিজের সাক্ষ্য হয়,তাহলে এটা হল জায়েয নয়। অনূরূপই ' ফাতওয়ায়ে আলমগিরী'র মধ্যে 'মুহিত' ইমাম সারখাসি হতে রয়েছে। আর যদি একজন নিজেই সাক্ষ্য দেবে আর দু'জন আর সাক্ষীর শাহাদাতের উপর শাহাদাত আদায় করে,তাহলে এটা প্রযোজ্য রয়েছে। বাযাযিয়া' তে এর ব্যাখ্যা রয়েছে.

''ফাতওয়ায়ে আলমগিরী' তে 'যাখিরা' হতে রয়েছে ঃ গৌন সাক্ষীর উচিৎ হল যে, আসল সাক্ষীর ও তার পিতার এবং দাদার সকলের নামের বর্ণনা করবে। এতদ্বপর্যন্ত যে,যদি তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়.তাহলে হাকীম তার সাক্ষ্য কবুল করবে না।

শাহাদাত আলাল শাহাদাত -এর মধ্যে এটাও হল জরুরী যে, তার মোতাবিক হুকুম হওয়া পর্যন্ত আসল সাক্ষীও শাহাদাতের যোগ্য হওয়াতে অবিচল থাকবে, আর শাহাদাতের মিথ্যারোপ করবে না। যেমন গৌণ সাক্ষী এখনও সাক্ষ্য দেয়নি কিংবা দেবে এবং যার উপর তখনও হুকুম হয়নি যে,উভয় আসল সাক্ষী হতে কোন সাক্ষী অন্ধ কিংবা গোঙ্গা কিংবা পাগল কিংবা মা'য়াযাল্লাহ মুরতাদ হয়ে গেছে, কিংবা বলেছে যে,আমি উক্ত সাক্ষ্যী কে নিজের শাহাদাতের সাক্ষ্য করেনি। কিংবা ত্রুটিগত ভাবে সাক্ষ্য করে দিয়েছে, তাহলে এই সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে।

''**দুররে মুখতারে**'' রয়েছে- অর্থাৎ, আসল সাক্ষীর শাহাদাতের যোগ্যতা শেষ হলে, গৌণ সাক্ষীর শাহাদাত বাতিল হবে যাবে। যেরূপ আসল সাক্ষী বোবা কিংবা অন্ধ হয়ে গেল কিংবা আসল সাক্ষী শাহাদাতের অস্বীকার করে, যেমন বলে যে, আমি কোন সাক্ষ্য দিইনি। কিংবা এরূপ বলে, আমি একে সাক্ষ্য বানায়নি কিংবা আমি ভুলবশতঃ একে সাক্ষ্য বানিয়েছি। (দুররে মুখতার, কেতাবুশ শাহাদাত ৮/ ২৬০-২৬১)

---------- (চলবে)

রোযা সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসলা

প্রশ্ন - ১: হারাম বস্তু ভক্ষণ করে রোযা রাখলে রোযা হবে কি-না ?

উত্তর:- রোযার ফরয আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু হারাম ভক্ষণ করার কারনে গুণাহাগার হবে। (আল্লাহ তায়ালা অধিক জ্ঞানী)[১]

চাঁদ উদয়ের ভুল সংবাদে যদি কেও রোযা ভেঙ্গে দেয় তার জন্য শরীয়তের হুকুম কী?

প্রশ্ন - ২: কি বলছেন ওলামায়ে কেরাম ও শারয়ে মাতিন এই মাসলার ক্ষেত্রে, চাঁদ দেখতে পাওয়ার ব্যাপারে মতভেদ দেখা দেওয়ায় ৩০ রমযানুল মোবারকে ইফতার করে নেওয়া হল এবং পরে জানা গেল যে,এই খবর হল মিথ্যা। খবর শোনার পর যদি খাবার দাবার বন্ধ না করে ,তাহলে তাকে কি কাফ্ ফারা দিতে হবে না কাযায় যথেষ্ট হবে? এবং যারা খবর পাওয়ার পর নিজেদের কুল্লি ও গরগরা করার মাধ্যমে মুখকে পবিত্র করে রোযা অবস্থায় থাকল -তাদের জন্য কি হুকুম আছে? উত্তর:-যে পানাহার চালিয়ে গেল মিথ্যা চাঁদ উদয়ের খবরের দ্বারা - সে গুনাহাগার হবে;কিন্তু তার জন্য কাফ্ফারা দিতে হবে না(শুধু একটি রাখবে)। আর যে খবর শোনা মাত্রই গরগরা করে নিল,তাহলে সে সাওয়াব পাবে এবং একটি রোযা তাকেও রাখতে হবে। (আল্লাহ তায়ালা অধিক জ্ঞানী)[২]

■ সফরে রোযা রাখার হুকুম কী?

প্রশ্ন ৩:- কি বলছেন ওলামায়ে কেরাম এ মাসলা প্রসঙ্গে,সফরের রোযা রাখা কি রূপ?

উত্তর:- যে নিজের ঘর হতে তিন মানযিল পরিপূর্ণ কিংবা এর হতে অধিক রাস্তা অতিক্রমের উদ্দেশ্যে বের হলে. তাতে নিয়াত শুদ্ধ হোক কিংবা অশুদ্ধ, যতক্ষণ পর্যন্ত না ঘরে ফিরে না আসে কিংবা কোন পথিমধ্যে কোথাও পনেরো দিনের অপেক্ষার নিয়াত না থাকলে তাকে মুসাফির বলা হয়। মুসাফির অবস্থায় সাহরীর সময় উপস্থিত হলে ঐ দিনে রোযাকে ছেড়ে দেওয়া এবং পরে তার কাযা রাখা বৈধ। আবার যদি রোযার দ্বারা তার কোন ক্ষতি না হয়, না রোযার ফলে তার সাথির কোন অসুবিধা না হয় তাহলে রোযা রাখায় উত্তম হবে। নতুবা কাযা করবে। ...(আল্লাহ তায়ালা অধিক জ্ঞানী)[৩]

প্রশ্ন:- শাবান মাসের ২৯ তারিখে আকাশ পরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও যদি চাঁদ দেখা না যায় তার জন্য হুকুম কি?

উত্তর:- শাবান মাসের ২৯ তারিখে চাঁদ উদয়ের স্থান পরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও চাঁদ দেখা না গেলে কাযী, মুফতী সহ কেও রোযা রাখবে না। তবে হ্যাঁ,চাঁদ উদয়ের স্থান যদি মেঘলা থাকে তাহলে মুফতী জনসাধারণকে দোহায়ে কুবরা(দ্বি-প্রহর)পর্যন্ত অপেক্ষার হুকুম দেবে, না কিছু খাবে ; না রোযার নিয়াত করবে । নিয়াত ব্যতীত রোযা রোযারই ন্যায়। এর মধ্যে যদি চাঁদের শরয়ী প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে সকলে রোযার নিয়াত করে নেবে রমযানের রোযা হয়ে যাবে(আল্লাহ তায়ালা অধিক জ্ঞানী)। আর যদি ঐ সময় অতিবাহিত হয় এবং কোথাও হতে চাঁদ দেখার খবর না আসে তাহলে মুফতী জনসাধারণদেব পানাহার করার হুকুম দেবেন.। [৪]

■ রোযা অবস্থায় টুথ পেষ্ট ব্যবহার

রোযা অবস্থায় টুথ পেষ্ট ব্যবহার করলে তা হল্কে পৌঁছানোর সম্ভবনা অধিক। এই কারণে এর ব্যবহার বৈধ নয়। (আল্লাহ তায়ালা অধিক জ্ঞানী)

১.সূত্রঃ–ফাতওয়া রেজবীয়া–কেতাবুস্ সওম ,১০ম খন্ড ৩৩০–৩৫১ পৃঃ, ২.সূত্রঃফাতওয়া রেযবীয়া–কেতাবুস্ সওম,১০ম খন্ড ৩৩০–৩৫১ পৃঃ, ৩.সূত্রঃ–ফাতওয়া রেজবীয়া–কেতাবুস্ সওম ,১০ম খন্ড ৩৩০–৩৫১ পৃঃ,৪.সূত্রঃ–বোখারী শরীফ ১ম খন্ড,ফাতওয়া রেজবীয়া–কেতাবুস্ সওম ,১০ম খন্ড ৩৩০–৩৫১ পৃঃ।

■ **রোযা অবস্থায় গুল ব্যবহার**

■ **রোযা অবস্থায় গুলের ব্যবহারের কয়েকটি ধরণ দেখা যায়:**

১.এরূপ ভাবে ব্যবহার করা: এমনভাবে দাঁতের তলদেশে রাখা, যার ফলে গুল থুতুর সহিত মিশে গিয়ে গলায় প্রবেশ করে। যেরূপ তামাক খাওয়ার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, এরূপ ভাবে ব্যবহারে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই জরুরী।

২. গুল দাঁতে লাগিয়ে ৫-১০ মিনিট রেখে দেওয়া এবং পরে কুল্লি করে নেওয়া।এরূপ ক্ষেত্রে ৫-১০ মিনিট রাখার কারণে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই থুতুর সহিত তা হল্কে প্রবেশ করে। এর দ্বারাও রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় , তবে এর জন্য কাযা আদায় করা ওয়াজিব।

৩.গুল এরূপ ভাবে ব্যবহার করা যে, শুধু মাত্র দাঁতে ঘসে নিয়ে সাথে সাথে পানি দ্বারা ধুঁয়ে নেওয়া । এভাবেও গুল ব্যবহার রোযা অবস্থাতে কঠোর নিষিদ্ধ।**[১]

■ **রোযা অবস্থা তে ইন হেলার ব্যবহার**

রোযা অবস্থাতে ইনহেলার ব্যবহার করা হারাম ও গুণাহের কাজ। এর দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।[২]

■ **বদ মাযহাবের আযানে ইফতার করা কিরূপ**

দেওবান্দি,ওহাবী এবং শিয়া সম্প্রদায়ের আযান প্রকৃতপক্ষে আযানের মধ্যে গণ্য নয়।[৩]

■ **সন্দেহের দিনে রোযা রাখা প্রসঙ্গ**

রমযান প্রমাণিত হয় চাঁদ দেখার উপর ভিত্তি করে কিংবা শাবান মাস ৩০ দিন পূর্ণ হলে। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে আর সেটা ২৯ শাবানের দিন হয়,তাহলে পরের দিন সকল প্রকার রোযা রাখা নিষিদ্ধ কেবলমাত্র পা বন্দির সহিত বরাবর নির্দিষ্ট নফল রোযা রাখা ব্যক্তি ব্যতীত। হাদিস শরীফে বর্ণিত-যে যে ব্যক্তি ইয়ামে শাক বা সন্দেহের দিন রোযা রাখল সে যে আবুল ক্বাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সহিত নাফরমানী করল। (সহীহ বোখারী- বাবু ইযা রয়াইতুমুল হেলালা ফা সুমু....., আবু দাউদ হাদিস ২৪২৫,নাসবুর রায়া ২/৪৪২)

■ **২৯ শাবান সন্ধ্যায় যদি চাঁদ দেখা না যায় তাহলে হুকুম ঃ-** ২৯ শাবান সন্ধ্যায় আকাশ পরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও চাঁদ দেখা না গেলে ৩০ তারিখ কাজী-মুফতী কেউই রোযা রাখবে না। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে মুফতী সাধারণদের দোহায়ে কুবরা অর্থাৎ অর্ধ দিবস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলবেন এবং ততক্ষণ কিছুই খাবে না। না রোযার নিয়াত করতে বলবেন। বিনা নিয়াতের রোযা রোযার ন্যায় হয়। এর মধ্যে যদি চাঁদের খবর শরীয়াত সম্মত ভাবে পাওয়া গেলে রোযার নিয়াত করে নেবে তাহলে রমযানের রোযা হয়ে যাবে। আর যদি উক্ত সময় অতিবাহিত হয় চাঁদ দেখার খবর শরীয়াত সম্মত ভাবে সাবস্ত্য না হয় তাহলে সাধারণদের খাবার পানাহারের হুকুম দেবেন। তবে হ্যাঁ,যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট দিনে রোযা রাখাতে অভ্যস্ত এবং সে দিন উপস্থিত হয় তাহলে সেই দিনের নফল রোযা রাখতে পারবে। সন্দেহের কারণে যদি রমযানের নিয়াত করে - কিংবা এরূপ ভেবে যে, যদি চাঁদ হয়ে যায় তাহলে রমযানের রোযা রাখছি নতুবা নফল; তাহলে গুনাহাগার হবে।

(ফাতওয়া রেজবীয়া-কিতাবুস সাওম)

--- ---

(ফায়সালায়ে ফিক্হ সেমিনার বোর্ড, দিল্লী)

১.ফাতওয়া মারকাযে তরবিয়াতিল ইফতা ১ম খন্ড ৪৭০ পৃ:, ২.ফাতওয়া মারকাযে তারবিয়াতিল ইফতা ১ম খন্ড ৪৭০ পৃ:, রোযার জাদিদ মাসলা ১ম পৃ:, ৩.ফাতওয়া রেজবীয়া ২য় খন্ড ৪২১ পৃ:।

সিলসিলায়ে আলিয়া ক্বাদেরীয়া বারকাতিয়া রেজবীয়া নুরীয়ার ৫ম শায়েখ

হযরাত সাইয়্যেদুনা ইমাম বাক্বীর রাদিয়াল্লাহু আনহু।

আয়েম্মা-এ- আহলে বায়েত আতহার দের মধ্যে ত্বরীকতের দলীল ও হুজ্জাত, মারেফাতে অগাধ পন্ডিত হলেন হযরাত সাইয়্যেদুনা ইমাম বাক্বীর রাদিয়াল্লাহু আনহু।

নাম ঃ - আবু জাফর

পরিচিত নাম ঃ - ইমাম বাক্বীর রাদিয়াল্লাহু আনহু।

উপাধি ঃ বাক্বীরুল ইল্‌ম (জ্ঞানের বিকাশদানকারী)

কুনিয়্যাত ঃ- অনেকের মতে তাঁর কুন্যিয়াত ছিল আবু আব্দুল্লাহ।

জন্মসন ঃ - ৫৬ হিজরী, সফর মাসের মঙ্গল বার। মতান্তরে রজব, ৫৭ হিজরী।

জন্মস্থান ঃ - মদিনা শরীফ

পিতার নাম ঃ সাইয়্যেদুস সাজিদিন হযরাত সাইয়্যেদুনা যাইনুল আবেদিন রাদিয়াল্লাহ আনহু।

মাতা ঃ সাইয়্যেদা যাকিইয়া আত্ব -ত্বাহিরা ফাতিমা বিনতে আল ইমাম আল হাসান- সাইয়্যেদু শাবাবি আহলিল জান্নাত- রাদিয়াল্লাহু আনহু। ইমাম যায়নুল আবিদিন রাদিয়াল্লাহু আনহু 'সিদ্দিকা' বলে অভিহিত করেছিলেন। ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আস স্বাদিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতে, হযরাত ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশে তাঁর ন্যায় আর মহান রমনী আর দৃষ্টিগোচর হয়নি। (ওসুলুল কাফী ১/৪৬৯ পৃঃ)

বিশেষ বৈশিষ্ট ঃ তিনি বংশগতভাবে পিতা ও মাতা উভয় দিক দিয়েই হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন।

তাঁর শ্রেষ্টত্ব ঃ তিনি জ্ঞানের ভান্ডার এবং খোদার কালামের সূক্ষতা বর্ণনার ক্ষেত্রে অগাধ জ্ঞান রাখতেন। (কাশফুল মাহযুব ১২৬ পৃঃ)

ওফাত ঃ - ৭ জিলহজ্ব ১১৪ হিজরী।

মাজার পাক ঃ জান্নাতুল বাক্বী, মদিনা শরীফ।

সিলসিলায় অবস্থান ঃ- সিলসিলায়ে আলিয়া ক্বাদেরীয়া বারকাতিয়া রেজবীয়ার ৫ ম শায়েখ।

আশ্চর্যতম ঘটনা ঃ সমকালীন বাদশাহ ইমাম বাক্বীর কে শহীদ করার উদ্দেশ্যে দরবারে ডেকে পাঠায়। ইমাম উপস্থিত হলে বাদশাহ আসন ছেড়ে দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করল এবং সম্মানের সহিত পাশে বসিয়ে বলল, আমি আপনাকে এখানে আসার আদেশ করে কষ্ট দিয়েছি- বলে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এরপর হযরাতকে সম্মানের সহিত উ পঢৌকন সহ বিদায় দিলেন।

তিনি চলে যাওয়ার পর মন্ত্রী সভাসদরা জিজ্ঞাসা করল- আপনি তো উনাতে শহীদ করার উদ্দেশ্যে আহ্বান করেছিলেন। অথচ তা না করে উল্টে সম্মান প্রদর্শন করলেন। খলিফা বলল- তিনি যখন আমার দিকে আসছিলেন তখন আমি দেখলাম তাঁর ডানে বামে অতিকায় ভয়ঙ্কর দুটি বাঘ। তারা যেন আমাকে বলছে- যদি তুমি তাঁর কোন ক্ষতি কর, তাহলে আমরা তোমায় ফেড়ে ফেলব। হযরাত ইমাম বাক্বীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর একজন গোলাম বলেন, তিনি প্রতি রাত্রিতে এমন দোয়া করতেন এবং আল্লাহর দরবারে ক্রন্দন করতেন। একদিন আমি তাঁকে বললাম, হে আমার নেতা! আপনি আর কতদিন এমনভাবে ক্রন্দন করতে থাকবেন? তিনি রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করলেন ঃ হে আমার বন্ধু ! হযরাত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এর এক সন্তান হারিয়ে যান। তিনি তাঁর জন্য কাঁদতে কাঁদতে চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ করে ফেলেন। আর কারবালার ময়দানে আমি আঠারো জন আত্মীয়কে হারিয়েছি তাই আমার রবের সমীপে ফরিয়াদ করা থেকে আমি কীভাবে বিরত থাকতে পারি। (কাশফুল মাহযুব)

--- ---

আমরা যাঁদের কে হারালাম

হযরাত আইনুল হক্ব সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি

(প্রাক্তন শিক্ষক জামিয়া রাজ্জাকিয়া কালিমিয়া অ্যারাবিক ইউনিভার্সিটি)

পৃথিবীতে মুসলমানদের সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য মহান রব্বুল আ'লামীন যুগে যুগে স্বীয় প্রতিনিধি হিসাবে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামকে প্রেরণ করেছেন। সর্বশেষ নবী হলেন আমাদের প্রিয় আক্বা মাওলা হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অতঃপর হুযুরের প্রতিনিধি হিসাবে যুগে যুগে উলামাদের আগমণ ঘটেছে। এই উলামারা হলেন হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ওয়ারিশ। আর এই উলামাদের দ্বারায় যুগে যুগে কোরআন ও হাদিসের রশ্মি বিশ্বে প্রতিভাত হয়। সেই আলেম সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন হলেন হযরাত মৌলানা **মহম্মদ** আইনুল হক্ব সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি। যিনি উলামাদের মধ্যে হক্ব সাহেব নামে পরিচিত।

জন্মকাল ও জন্মস্থান ঃ হক্ব সাহেবের স্বীয় হস্তলিখিত ডাইরী অনুযায়ী জানা যায় যে, ১৯৬১ সালে ঝাড়খন্ড রাজ্যের রাজমহল এলাকার কয়লা বাজার নামক স্থানে হযরতের জন্ম হয়। তাঁর পিতা হলেন **সেখ মহম্মদ হাদিস**।

শিক্ষাজীবন ঃ হক্ব সাহেবের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় গ্রামেরই এক ক্ষুদ্র মাদ্রাসা সুলাইমানিয়াতে। পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে সুদূর উত্তর প্রদেশে রাজ্য গমন করেন। প্রথমে মাদ্রাসা ক্বাদিরীয়াতে **ভর্তি** হয়। এরপর হুযুর সাদরুল আফাজিলের প্রিয় প্রতিষ্ঠান জামেয়া নাঈমীয়াতে গমন করেন। এখান থেকে হুযুর আলা হযরত প্রতিষ্ঠিত বিশ্বখ্যাত মাদ্রাসা মানযারে ইসলাম গমন করেন। এবং পরিশেষে বেনারস শহরে খ্যাত মাদ্রাসা হামিদীয়াতে **ভর্তি** নেন। এই মাদ্রাসা শ্রেষ্ঠ ফকীহ হযরত শামসুদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি কতৃক প্রতিষ্ঠিত।

কর্মজীবন ঃ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষা অর্জনের পর হক্ব সাহেব মুরাদাবাদের নিজ শিক্ষাজীবনের খ্যাতনামা মাদ্রাসা জামেয়া ক্বাদেরীয়া যোগাদান করেন। কয়েক বছর উক্ত মাদ্রাসায় শিক্ষা প্রদানের পর নিজ পিতার ইন্তেকালের সময় জন্মস্থানে কয়লা বাজারে আসেন। গ্রাম সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র মাদ্রাসাতে স্বীয় কর্মজীবনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করেন। খুবই অল্প পারিশ্রমিকের পরিবর্তে খেদমত চালিয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে খ্যতি অর্জন করেন। পরবর্তীতে মুরাদাবাদের মাদ্রাসার শিক্ষক মন্ডলীর অনুরোধে পূণরায় আগের মাদ্রাসায় ফিরে আসার আহ্বান জানান। তিনি শিক্ষক মন্ডলীর আবেদনকে লাব্বায়েক জানিয়ে পূণরায় পূর্বের মাদ্রাসায় ফিরে যান।

একদা হক্ব সাহেবের কর্ণগোচর হয় যে, হযরত মাসরুর আহমদ কালিমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় মুরিদদের উপস্থিতিতে নিজ মাদ্রাসা জামেয়া রাজ্জাকীয়া কালিমীয়ার জন্য একজন উপযুক্ত শিক্ষক অন্বেষণের কথা বলেন। কোন একজন আলেম হক্ব সাহেবের জ্ঞান-গরীমার কথা সেখানে উত্থাপন করলে পীর সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। হযরত হক্ব সাহেব এ খবর শুনে মুরাদাবাদ হতে বাড়ি ফেরার পথে মীরানপুরে নেমে সোজা কাটরা শরীফে গিয়ে পীর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পীর সাহেব খুশি হয়ে প্রস্তাব দেন যে, আপ কো মুরাদাবাদ মে জিতনি তানখা মিলতি হ্যায় উতনি হি দি জায়েগি, আপ শাইদাপুর মুর্শিদাবাদ মাদ্রাসা আ জাও। পরবর্তীতে হক্ব সাহেব মুরাদাবাদ মাদ্রাসাকে খায়রাবাদ জানিয়ে মুর্শিদাবাদের প্রশিদ্ধ মাদ্রাসা জামেয়া রাজ্জাকীয়া কালিমীয়া **রনজিতপুর** চলে আসেন।

মুর্শিদাবাদের মাদ্রাসায় হযরতকে কোনরূপ অসুবিধার সম্মুখিন হতে হয়নি কারণ, হযরতের শশুর বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদ জেলাতেই। সুতরাং দীর্ঘ ৩৬ বছর যাবৎ উক্ত মাদ্রাসায় উচ্চমানের মুদাররিসের স্থলে আসীন ছিলেন। তাঁর হাজার হাজার শাগরীদ অনেকে আজও পশ্চিমবঙ্গের কোনায় কোনায় খিদমতে লিপ্ত রয়েছে।

গৃহ নির্মাণ ঃ যেহেতু মুর্শিদাবাদের মাদ্রাসা জামেয়া রাজ্জাকীয়া কালিমীয়া তে থাকা নির্দিষ্ট করে ফেলেন সেহেতু মাদ্রাসা হতে অনতিদূরে জঙ্গীপুরে শহরের সাহেব বাজারের ফাতে খাঁ জঙ্গলে জমীন ক্রয় করে বসতবাড়ি স্থাপন করেন।

সন্তানসন্ততি ঃ হক্ব সাহেবের মোট সন্তান হল ৫ জন তন্মধ্যে এক কন্যা শৈশবেই ইনতেকাল করে। পুত্র সন্তানরা হলেন - ১. রবিউল ইসলাম আশরাফী, ২. জাহেরুল হক্ব জামালী, ৩. মৌলানা খাইরুল হাসান আশরাফ জামালী। আর এক সাহাবজাদী হলেন ৪. মোসাম্মাত রহিমা খাতুন রেজবীয়া, যাঁর শাদী নুরুল আরেফিন রেজবী আযহারী সাহেবের সহিত হয়েছে এবং তাদের ঔরসে তিন কন্যা ১. ইরাম ফাতেমা, ২. নুসরাত ফাতেমা, ৩. সিদরা ফাতেমা, ও এক পুত্র, ৪. কাজি মহম্মদ হামজা জন্মগ্রহণ করেছে।

দ্বীনি খিদমত ঃ দারস তাদরীসের সাথে সাথেও দ্বীনি খিদমতে বিভিন্ন রাস্তায় নিজেকে নিযুক্ত করেন। খিদমতের তাবলিগী ধরণ ছিল তিনি দীর্ঘদিন মাসজিদের ইমামের স্থলে নিযুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন গ্রামে ও শহরের কসবায় বহু বিপথগামীদের ইসলামের দিকে ধাবিত করেন, কোরআন শরীফ ও হাদিসের জ্ঞান প্রদান করেন। সাথে সাথে তিনি শের শাইরীতে খুবই পান্ডিত্য রাখতেন। তাঁর লিখিত হামদে বারি তা'য়ালা, নাতে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংখ্যা হল অনেক। হযরতের লিখিত নাত-মানক্বাবাত বেরেলী শরীফে কাসনায়ে মুফতী আযমে পঠিত হয়। নাওয়াসায়ে হুযুর মুফতী-ই-আযম হুযুর জামালে মিল্লাত তাঁর লিখিত নাত মানক্বাবাতের খুব প্রশংসা করেন।

বা'য়াত ও খেলাফত ঃ হযরতের লিখিত ডাইরীর লেখা অনুযায়ী প্রাথমিক অবস্থায় সৈয়দ মাসরুর আহমদ কালিমী রহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে বাইয়াত গ্রহন করেন। পরে সরকারে কালা রহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতেও বাইয়াত ও তালিব হন।

বর্ধমানে নুরুল আরেফিন রেজবী আযহারী সাহেবের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার বাৎসরিক জালসায় বহু আলেমের উপস্থিতিতে হযরত জামালে মিল্লাত মাদ্দাজিল্লাহুল আলি হযরত হক্ব সাহেব কে সিলসিলায়ে আলিয়া ক্বাদেরীয়া রেজবীয়া নুরীয়ার খেলাফৎ প্রদান করেন।

অসুস্থতা ঃ বিগত দু'বছর পূর্বে নামায আদায়ের পর মুসাফা করার সময় হযরত ষ্ট্রোকে আক্রান্ত হন। দীর্ঘ দিন ধরে শয্যাগত অবস্থায় থাকেন। শয্যাগত অবস্থাতেও নামায কাযা হতে দেননি, নাত-মানক্বাবাতের লেখনী বন্ধ করেন নি। ওফাতে কয়েকদিন পূর্বেও স্বীয় নওয়াসার আক্বীক্বাতে খলীফায়ে হুযুর জামালে মিল্লাত গুলজার রেজবীর উপস্থিতিতে সুন্দর মানক্বাবাত পেশ করেন।

ওফাত ঃ জ্ঞানগরীমার ও তাক্বওয়ার পা-বন্দ হযরত হক্ব সাহেব ক্বীবলা ২৬ জামাদিল উখরা ১৪৪৫ হিজরীর মোতাবিক ১০ ডিসেম্বর ২০২৩ দ্বি-প্রহর তিনটের সময় এই দুনিয়া ফানি হতে দারুল বাক্বার দিকে চির বিদায় নেন।

জানাযা কাফন দাফন ঃ হযরতের জানাযায় বাংলা বিহার ঝাড়খন্ডের বিভিন্ন এলাকা হতে অগণিত আলেম উলামা ও সাধারণ লোকের আগমন ঘটে।

ঃ গোসলের সময় যাঁরা হাজির ছিলেন ঃ

১. খলিফায়ে হুযুর জামালে মিল্লাত মুফতী মুজাহিদুল ক্বাদেরী,

২. খলিফায়ে হুযুর জামালে মিল্লাত নুরুল আরেফিন রেজবী আযহারী

৩. মৌলানা খাইরুল হাসান জামালী

৪. মৌলানা নুরুদ্দিন রেজা ক্বাদেরী

৫. মৌলানা বাশিরুদ্দিন রেজবী জামালী

৬. মৌলানা আব্দুল ওয়াজিদ রেজবী

৭. রবিউল ইসলাম আশরাফী

৮. জাহেরুল হক্ব জামালী

৯. নুরুল হাসান রেজবী

১০. কাজী নুরুল ইমরান রেজবী

১১. মহম্মদ ঈসা জামালী (গুড্ডু)

১২. সুজাউদ্দিন ইউসুফ জামালী (সঞ্জু)

■ **জানাযার নামাযের ইমামতী করেন হযরত হক্ব সাহেব ক্বীবলার ছোট সাহেব জাদা মৌলানা খাইরুল হাসান আশরাফ জামালী।**

ঃ মারক্কাদে যারা নেমে ছিলেন ঃ

১. খলিফায়ে হুযুর জামালে মিল্লাত মুফতী মুজাহিদুল ক্বাদেরী,

২. খলিফায়ে হুযুর জামালে মিল্লাত নুরুল আরেফিন রেজবী আযহারী

৩. কাজী নুরুল হাসান রেজবী

হযরতের দাফনের পর ৮ বার আযান দেওয়া হয়। যাঁরা যাঁরা আযান দেন-

১. খলিফায়ে হুযুর জামালে মিল্লাত নুরুল আরেফিন রেজবী আযহারী

২. মৌলানা খাইরুল হাসান আশরাফ জামালী

৩. উমার ফারুক জামালী

৪. সাইন রেজা

৫. মৌলানা আমিন রেজা

৬. হাফিজ আব্দুল ক্বুদ্দুস

৭. শায়েখ ইযায আহমদ আযহারী

৮. মৌলানা ইসাহাক্ব

শানে হযরত আইনুল হক রহমাতুল্লাহি আলাইহি

ছেড়ে এ ধরা হতে হক সাহেব হলেন রওয়ানা।
কাওকে কাদিয়ে আর কারোর করে দিবানা ॥

ফার্সিতে দরিয়া তুমি আরবীতে যে সাগর,
ধন্য হল পেয়ে তোমায় ওই জঙ্গিপুর নগর।
তাকওয়াই যেমন ছিলে পাহাড় বঙ্গে নাই তুলনা ॥

শামসুদ্দিন মিস্বাহীর ভাষায় পড়াতেন দেখে বিনা,
মোয়াজ্জাম সাহেব বলে ঘরের পর্দায় তুলনা হয় না।
চলন বলনে তোমার ওপর কারো শিকায়াত ছিল না ॥

পাঠিত হয় লেখা নাত পাক ও ভারতে,
সাবলীল ভাষায় উর্দুতে ছন্দে জবাব দিতে।
মোহিত হতো লেখা নাতে ওই নুরী কাসানা ॥

ব্যপ্তি জ্ঞানের ভান্ডার তোমার ইউ. পি. ও বাংলায়,
রিজভী দুলহা হলে জামালে মিল্লাতের উসিলায়।
বলে মুফতি আলিমুদ্দিন 'জামালী খলিফা' হওয়া সহজ না ॥

বলি কি আর আমি আরিফ ঘন্টায় হবেনা করে তারিফ,
শেষ দিকেও নামায আদায় করলেন শরীয়ত মোতাবেক।
হারিয়ে তাঁরে করি আফসোস বহু কিছু রইল অজানা ॥

♦ ♦ ♦

আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) -এর নাত ও তার অর্থ ও ব্যখ্যা :

কলম--কাজী আব্দুল ওয়াজিদ আলীগ রেজবী

ইমাম আহলে সুন্নাহ মুজাদ্দিদে আযম কুদস সিরা-উল আযীয-এর এই সুন্দর কবিতার দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় গোড়ালির গুণাবলী ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন ভালবাসার সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়ে।

عارض شمس وقمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں

عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں

.دوستارے دس ہلال دو قمر دو پنجے خر

ان کے تلوے . پنجے . ناخن پائے اطہر ایڑیاں

ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیئے

بے تکلف جس کے دل میں یوں کریں گھر ایڑیاں

اے رضا توفان محشر کے تلاطم سے نہ ڈر

شاد ہو ہیں کشتیٔ امت کو لنگر ایڑیاں

নাবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় গোড়ালিদ্বয় সূর্য ও চন্দ্রের মুখমণ্ডলের চেয়েও উজ্জ্বল। বরং, এই বরকতময় ও চকচকে সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ গোড়ালিগুলি হল, যেন আসমানের চোখের উজ্জ্বল পুতুল। চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় দুটি পৃষ্ঠতল, দুটি তারা এবং দশটি অর্ধচন্দ্র (প্রথম রাতের চাঁদ) অর্থাৎ আপনার চরণদ্বয়ের দুই পৃষ্ঠতল হলো চন্দ্র ও সূর্য। আর আপনার বরকতময় গোড়ালি দুটি,দুটি উজ্জ্বল তারকা এবং সবচেয়ে উত্তম দশটি নখর প্রথম রাত্রিব

অর্ধচন্দ্রমার মতো। একথা প্রসিদ্ধ যে, পাথরগুলো হজরত সৈয়দ এ আলম (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মহিমান্বিত পায়ের তলার স্পর্শে আটাব মতো নরম হয়ে যেতো এবং সেই পাথরগুলো এতোটাই সৌভাগ্যবান যে, তারা তাদের বুকের মধ্যে আপনার কদমদ্বয়ের নকশাকে চিরতরে খোদাই করে নিত। সাইয়্যেদি আলা হযরত রহমতুল্লাহি আলাইহি এই সব পাথরের সৌভাগ্য ও আনন্দের কথা স্মরণ করে বলেন যে, ওই পাথরের এতোটাই সৌভাগ্য যে তারা আপনার বরকতময় গোড়ালির চিহ্ন তাদের বক্ষের উপর সংরক্ষিত ও খোদাই করে নিয়েছে।ঞ্চকিন্তু হায়, আমাদের বুক এবং হৃদয় যে এই সম্মান হইতে অনেক অনেক দূরে।

যদি! সেই বরকতময় পাথরটি পেতাম , তাহলে সেই পাথরের সঙ্গে আমার এই বুককে ঘষতাম আমার ভাগ্য বদলে যেত এবং আমার এই বুকটা স্নিগ্ধ শান্তির শহরের ন্যায় হয়ে যেতো।

হে রেজা! কিয়ামতের ময়দানের ভয়াবহ ও ভয়ঙ্কর অবস্থায় ভয় পেয়ো না, আনন্দ করতে থাকো কারণ, কিয়ামতের ময়দানে এই মৃত উম্মতের নৌকার নোঙর (অর্থাৎ যে রশি দিয়ে প্রচণ্ড ঝড়ো অবস্থায় নৌকা থামানো হয়)

হজরত শাফিয়ে আযম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বরকতময় ও পবিত্র গোড়ালি দুটি। অর্থাৎ আপনার গোড়ালি দুটি যেন নৌকার নোঙর।

পরিশেষে, এটা হলো শুধুমাত্র এই কবিতাটির আক্ষরিক অর্থ ও ব্যাখ্যা ইমাম আহমদ রেযা কাদরী বারকাতী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর অন্তরের অবস্থা কী বর্ণনা করতে পারি।

جا بجا پر نو فلک ہیں اسمان پر ایڑیاں

دن کو ہیں خورشید شب کو ماہ و اختر ایڑیاں

আকাশের মধ্যে এমন কোনও জায়গা আছে কি যেখানে আমার হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গোড়ালির নুর ছড়ায় নি।

হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই ওই গোড়ালি হইতে নুর ভিক্ষা নিয়ে আজও দিনের বেলায় সূর্য জ্বলজ্বল করছে, ওই

গোড়ালির নুরের বরকতে রাত্রে চন্দ্রের পূর্নিমা ও তারকারাজিরা ঝকঝক করছে।

نجم گردوں تو نظر آتے ہیں چھوٹے اور وہ پاؤں

عرش پر پھر کیوں نہ ہوں محسوس لاغر ایڑیاں

তারারা আকাশের বুকে অর্থাৎ আকাশের সবচেয়ে নিচের স্তবকে আছে, বৃহদাকার (পৃথিবীর চেয়েও হাজার হাজার গুণ বড়ো হয়)হওয়া সত্ত্বেও সরিষার দানার মতো দেখা যায়। আরশ তো সপ্তম আসমানেরও উপরে আছে। হাদীস শরীফ থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন - আসমানের চওড়া অংশ প্রথম হইতে দ্বিতীয়ের মাঝখানের দুরত্ব হলো পাঁচশত বছরের দুরত্ব । তো তোমরা এটা ভাবো না যে, আরশে মোয়াল্লার চোখের তারা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গোড়ালিগুলি এত ছোট কেন? বরং উনার মর্যাদা ও মহানতা সমস্ত দুনিয়াকে ঘিরে রেখেছে, উনার সম্মানিত মহিমান্বিত ব্যাক্তিত্ব আমাদের চিন্তা-ভাবনার থেকেও অনেক উঁচুতে বিরাজমান। এই কারণে গোড়ালি দুটি এতো ছোট ও দুর্বল আমরা দেখতে পাই।

دب کے زیر پا نہ گنجائش سمانے کی رہی

بن گیا جلوہ کف پا کا ابھر کر ایڑیاں

প্রেমিরা শুনে নাও আদবের জন্য প্রয়োজন ছিল গোড়ালি দুটি পেছনের দিকে না হয়ে, সামনের দিকে হওয়া। কিন্তু এর লুকায়িত রহস্য হলো- আপনার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোবারক কদমদ্বয়ের নিচে দেবে যাওয়ারও ক্ষমতা কারও নেই সুতরাং কদমদ্বয়ের নিচের প্রকাশিত অংশই উঠে গিয়ে গোড়ালিদ্বয়ের সৃষ্টি। পেছনে হওয়া যদি আদবের বিপরীতে হয় তাহলে সামনে হওয়াটাও আদবের বিপরীতে, কদমদ্বয় যখন মাটিতে থাকে তখন আপনি সামনের দিকে বা পিছনের দিকে সে রকম কিছু ব্যাপার নেই। আপনার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত শরীর মোবারকই আদবের সাথে নুরের দ্বারা সৃষ্ট।

সুবহানআল্লাহ! আপনার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোড়ালিদ্বয়ের মর্যাদা ও দাপট এতোটাই যখন আপনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত ওমর ফারুক, হযরত ওসমান গনি রাদিআল্লাহু আনহুম ওহূদ পাহাড়ের উপর চড়লেন তখন ওহূদ পাহাড় আপনার কদমদ্বয়কে চুম্বন করতে শুরু করে এবং উত্তেজিত (ওজদ) হয়ে কাঁপতে শুরু করে(ভূমিকম্প শুরু হয়ে যায়)আপনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা গোড়ালি দ্বারা পদস্খলন করে বললেন -

এ ওহূদ পাহাড় থাম তোর উপর একজন আল্লাহর রসুল, সিদ্দিক ও দুই শহীদ ব্যাক্তি বিরাজমান, তক্ষনই ওহুদ পাহাড়ের ভূমিকম্প শান্ত হয়ে যায়। এটা আপনার মোজেজার মধ্যে একটি।

সুবহানআল্লাহ আপনার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোড়ালিদ্বয়ের মহত্ত্ব যদি এতো হয় তাহলে আপনার মহত্ত্বতা কতটা হতে পারে?

এই হাদীস শরীফ থেকে প্রকাশ্য যে সাহাবাদের সাহাবি হবার কথা ঘোষণা আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু একজন সাহাবি তার ঘোষণা আমার আল্লাহ কোরআনে করেছেন। এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাহাড়ের চূড়ায় উঠে করেন।

---------------(চলবে)

------- --------

রমজান মাস আত্ম শোধনের মাস

কলমে ঃ মুফতী আশরাফ রেজা নাঈমী
নায়েবে ক্বাজি, ইদারায়ে শারঈয়াহ দারুল কাজা ওয়াল ইফতা, (রাজমহল ঝাড়খন্ড)

ইসলামী বর্ষপুঞ্জির নবম মাসকে আল্লাহ তা'য়ালা রমজান মাস নামে বিভূষিত করেছেন। এই নামটি আল কুরআনের সুরা আল বাকারার একশত পচাঁশি নম্বর আয়াতে মাত্র একবার এসেছে। এবং রমজান কে রমজান এই কারণে বলা হয়েছে, যেহেতু সে রোজাদারের গুনাহ কে জ্বালিয়ে দেয় । এই মাসের বিশিষ্ট ইবাদত হল রোজা, এবং রোজা হল ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্তর্ভুক্ত একটি বিশিষ্ট স্তম্ভ। উক্ত মাস আল্লাহ তা'য়ালার নৈকট্য লাভের একটি সুর্বণ সুযোগের মাস। অন্যান্য মাস অপেক্ষা আল্লাহ তা'য়ালা অধিক মেহেরবানী, অত্র অর্পিত বর্ষিত হয়। আর যে বিশিষ্ট মাসে নানা প্রকার সাওয়ার ইবাদত ও রিয়াযতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা পক্ষ হতে বিতরণ হয়ে থাকে, অবশ্যই সেখানে আত্ম শোধনের সুদৃঢ় বিশ্বাসও প্রতিষ্ঠিত। তাই আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে যেমন পূর্ববতীদের উপর ফরয হয়েছিল যাতে তোমাদের পরহেজগারী অর্জিত হয়।- (সুরা বাকারা আয়াত নং ১৮৩)

উক্ত বর্ণিত আয়াতে মুমিনদের উপর পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় রোজা রাখা ফরয করা হয়েছে। যাতে তারা মুত্তাক্বী ও পরহেজগার হয়ে উঠতে পারে। প্রকাশ্য থাকে যে, পরহেজগারী অবলম্বন করার জন্য আত্ম শোধন অতি আবশ্যক। তাহলে, আত্মশুদ্ধি কি করে হতে পারে? সেটি একটি মূল লক্ষণীয় বিষয় ! সেক্ষেত্রে একটি মূল লক্ষণীয় বিষয় ! সেক্ষেত্রে কয়েকটি হিকমত ও পদ্ধতির প্রতি আমল অবশ্যই কাম্য। যেমন তাকওয়া-তাহারত- সবর ও শুকুর এবং রেযায়ে এলাহী প্রাপ্তি।

এই প্রভৃতি আমলই আত্ম শোধনের জন্য সহযোগী। আর মাহে রমজানুল মোবারকের রোজার মধ্যে উক্ত সব হেকমতী আমল বিদ্যমান।

সর্বাগ্রে পাঠকদের জানা উচিৎ যে, রমজান মাস এবং তার রোজার এমন কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, প্রায় সব প্রকার আত্ম শোধনের প্রক্রিয়া ও আধ্যাত্মিক শক্তি তার ভিতরে বিরাজমান? প্রকৃতপক্ষে রমজান মাসের নফলের সাওয়াব সুন্নাতের সওয়াব সমান, এবং সুন্নাতের সওয়াব ওয়াজিব সমান এবং ওয়াজিবের সওয়াব ফরজ সওয়াবের সমান, এবং যে ব্যক্তি এই মাসে একটি ফরয আদায় করল, সে যেন অন্য মাসে সত্তরটি ফরয আদায় করল, এবং এই মাসে রয়েছে এমনি একটি রাত যে হাজার মাস থেকেও অতি উত্তম, আর এটা সবরের মাস এবং সবরের সওয়াব একমাত্র জান্নাত। এবং এ মাসে অভিশপ্ত শয়তান কে শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়, জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়। এবং জাহান্নামের সব দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এবং আরো জানতে হলে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রমজানের রোজার ব্যাপারে তাগিদ ও তার গুরুত্বের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। এবং এই একটি শর্তের উপর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কায়েম থাকতে হবে, যেন কোনো শরিয়ী ওযুর ছাড়া একটি ও রোজা ভঙ্গ না হয়ে যায়। কেন না যে, রমজান মাসের একদিনের রোজা না রাখলে মানুষ শুধু গুনাহগারই হয় না, ঐ রোজার পরিবর্তে আজীবন রোজা রাখলেও রমজানের এক রোজার যে মর্যাদা ও কল্যাণ, যে অনন্ত রহমত, খায়ের ও বরকত তা কখনো লাভ করতে পারবে না, এবং কোনোভাবেই এর যথার্থ ক্ষতিপূরণ আদায় হবে না। বুখারী শরীফের সহীহ হাদীসে রয়েছে।

অর্থ ঃ হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি অসুস্থতা ও ওযুর ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে রমজানের একটি রোজাও ভঙ্গ করে, সে আজীবন রোজা রাখলেও ঐ রোজার হক আদায় করতে পারবে না।

(সহীহ বুখারী ১/২৫৯)

তবে যে কোনো মহৎ কার্য আল্লাহ তাআলার রহমত -ক্ষমা এবং পুরস্কার ছাড়া সম্পন্ন হয় না। নিম্নে একটি হাদিস পেশ করা হচ্ছে, যার ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণভাবে আত্ম শোধনের দিকে অবশ্যই ইঙ্গিত রয়েছে।

অর্থ ঃ রমজান এমনি একটি মাস যার প্রথম থেকে রহমত এবং মাঝ থেকে মাগফেরাত এবং শেষের দিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রাপ্তি হয়।

বুঝা গেল রমজান মাসের প্রথম দিন থেকেই আল্লাহু তাআলার রহমত রোজাদার ব্যক্তির সঙ্গী হয়ে যায়,যাতে রোজদারের তাকওয়া অবলম্বন করতে কোনো রকম ব্যাঘাত না ঘটে।

আসলে রোজা রাখা একটি এমনি মহা উদ্দেশ্য যার দ্বারা মুমিন ব্যক্তি আপন জীবনে খোদা ভীরুতার সারমর্ম এবং হৃদয় ও তার আত্মা কে পুনরুজ্জীবিত করার শক্তি পায়। রোজা থেকে অর্জিত পরহেজগারীর ভালোভাবে যদি হেফাজত করা যায় তাহলে একজন সাধারন মানুষ হলেও তার অভ্যন্তরীণ জীবনে এমনই এক সর্বাঙ্গীণ বিপ্লব ঘটতে পারে, যা তার জীবনের প্রতি দিন- রাত সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে উঠবে। তাকওয়া অর্থাৎ হারাম কাজ থেকে বঞ্চিত থাকা। হারাম কাজ যেমন, কোনো একটি রোজা না রাখা , জেনে বুঝে নামাজ পরিত্যাগ করা , মিথ্যা -চুগলি- চুরি -জেনা -সুদ, এক কথায় আল্লাহ তা'আলার না ফরমানি করা। এগুলো হলো স্বাভাবিক তাকওয়া। কিন্তু রোজার তাকওয়া এর চাইতে বেশি কঠিন, যেমন উপরোক্ত হারাম কাজসমূহ ছাড়া রোজা অবস্থায় নিজ স্ত্রীর সঙ্গে জেমা করা ইত্যাদি হারাম।

রোজদার বান্দাকে সবর ও শুকুর উভয় মনযিলও অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হয় , যেহেতু রোজা হচ্ছে নিজেকে পানাহার এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত রাখার নাম। এই অবস্থায় তৃষ্ণায় হলক শুকিয়ে গেলেও ক্ষুধায় কাতর হলেও ধৈর্য ধারণ , এবং আল্লাহ তায়ালার বারগাহে শুকুর গুজার হয়ে, মন - প্রাণ - শরীর - ইচ্ছা সবই তার দরবারে অর্পণ করে দেয়া , এগুলো সবই একমাত্র আত্ম শোধনের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার রোজদার বান্দার উপর আধ্যাত্মিক অনুগ্রহের প্রতিদান। আর রোজা রাখার মূল উদ্দেশ্য ও ছিল যেন আল্লাহর রেযা মন্দী (সন্তুষ্টি)রোজদার বান্দা লাভ করতে পারে। আর এই ধারাবাহিকতা যদি ক্রমে ক্রমে উচ্চ মোকাম পর্যন্ত পৌঁছায় ,তাহলে সে বলবে।

(বুখারী শরীফ ১/২৫৪)

আরো একটি হাদিস দেখুন।

অর্থ ঃ হযরত সাদ বিন সহল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। জান্নাতের একটি দরজা কে রাইয়ান বলা হয় রোজ কিয়ামতে সে দরজা দিয়ে একমাত্র রোজদার গন প্রবেশ করবেন, তাদের ছাড়া অন্য কেউ সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না।

(সহীহ বুখারী ১/২৫৪)

আল্লাহ তাআলা আপন হাবিবে আলা আলাইহিস সালামের সাদকায় রমজান মাসের রোজার বরকতে আমাদের হৃদয় রুহানি আলোকে আলোকিত করেন। (আমীন)

-------- --------

-------- -------- -------- --------

-------- --------

ফতওয়া বিভাগ

কবরে শাজরা শরীফ রাখার হুকুম

আসসালামু আলাইকুম,

কবরের ভিতরে কি শাজরা শরীফ রাখা চলবে? সিনার উপরে কি রাখা চলবে ? সঠিক কোন স্থানে রাখতে হবে দলীল সহকারে আলোচনা করবেন।

উত্তরঃ- ওয়া আলাইকুমুস সালাম।

মৃত ব্যক্তির কবরে শাজরা রাখা হল উত্তম।

তবে সিনার উপরে রাখতে বারণ করা হয়েছে। কারণ, শরীর গলন কিংবা পেটের নোংরা হতে শাজরাটিকে হেফাজতের উদ্দেশ্যে।

শাহ আব্দুল আযীয রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত ব্যক্তির মাথার দিকে তাক বানিয়ে রাখার কথা উল্লেখ করেছেন। হুযুর আলা হযরাত মুজ্জাদ্দিদে দ্বীন-ও -মিল্লাত শাহ ইমাম আহমদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ক্ষেত্রে ক্বীবলার দিকে দেওয়ালে তাক করে রাখাকে উত্তম বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, মায়্যেত কে কবরে রাখার পর যে দিকের দেওয়ালে রাখা সুবিধা মনে হবে সেদিকে ছোট গর্ত করে রাখা চলবে। যেটি মায়্যেত কে ফায়দা পৌঁছাবে এবং সেটিও নষ্ট হওয়া ও নোংরা থেকে সুরক্ষিত থাকবে।[১]

وَاللّٰہُ اَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُہ اَعْلَم صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

১ . ফাতওয়ায়ে আফ্রিকীয়া ২৮ পৃ

দোয়া প্রার্থী- ফকীর মোহাম্মাদ নুরুল আরেফিন রেজবী আমহারী
ফিক্‌রে রেজা দারুল ইফতা -পূর্ব বর্ধমান;পঃবঃ,ভারত
৪ঠা জামাদিল আখির ১৪৪৫ হিজরী, ১৮ ই ডিসেম্বর ২০২৩

পীর কে খোদা বলা কুফরী ও শীরক

আসসালামু আলাইকুম,

কোন পীর সাহেবের উপস্থিতিতে পীর সাহেব কে লক্ষ্য করে খোদা বলা কিংবা খোদা মানা এবং এরূপ বলা কে সমর্থন করা শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিরূপ?

উত্তরঃ- ওয়া আলাইকুমুস সালাম।

পীরকে খোদা বা আল্লাহ মানা হল কুফর ও শীরক। [১] এরূপ ব্যক্তকারী এবং এরূপ বলা কে সমর্থনকারী কাফের মুরতাদ এবং ইসলাম বহির্ভূত।

وَاللّٰہُ اَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُہ اَعْلَم صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

১. রাদ্দুল মুহতার ৩/৩৮৭পৃঃ। ২. ফাতওয়া খাইরিয়া ১/২০৭ পৃঃ

''হানাফী মাযহাবের বর্তমান রুপই হল মাসলাকে আলা হযরত''

শেরে আসাম, খলীফা মোহাম্মাদ ফারুক আব্দুল্লাহ নূরী,
দরং, আসাম।

হানাফী মাযহাবের বাস্তব রূপ হইল মাসলাকে আ'লা হজরত। এই বোধটুকু যাহার মধ্যে নাই সে হইল একজন জাহেল ও যালেম। অখন্ড ভারতে ওহাবীয়াতের বীজ বপনকারী হইলেন সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবী। আলাউদ্দীন জিহাদী হইল সাইয়েদ আহমাদ রায়বেরেলবীর মতাদর্শে (আটরশি দরবার) র মানুষ। এইজন্য 'মাসলাকে আ'লা হজরত' এর সঠিক স্বরূপ তাহার নজরে ধরা পড়ে নাই।

আলাউদ্দীন জিহাদী 'মাসলাকে আ'লা হজরত'এর ঘোর বিরোধী। যেমন জুময়ার দিন খুতবার আজান মসজিদের বাহিরে দেওয়া আ'লা হজরতের মাসলাক। অখন্ড ভারতের সর্বত্রে সুন্নী উলামায় কিরাম এই আজানটি মসজিদের বাহিরে দিয়া থাকেন। কেবল তাই নয়, বরং ইহার স্বপক্ষে আ'লা হজরত থেকে আরম্ভ করিয়া বহু আলেম স্বতন্ত্র কিতাব লিখিয়াছেন। জিহাদী সাহেব এই মসলায় চরম বিরোধীতা করতঃ দেওবন্দী ওহাবীদের দলীলাদীর সাহায্য নিয়া এমন ভাবে লিখিয়াছেন যে, শত শত সুন্নী মানুষ ধোকায় পড়িয়া যাইবে।

আলাউদ্দিন জিহাদী মহিলার কবর জিয়ারতের মাসয়ালায় চরম ভুল করেছেন। আলা হজরত রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুকে হানাফী মাজহাবের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন, যা তার অজ্ঞতাকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করেছে।

আ'লা হজরত থেকে আরম্ভ করিয়া সমস্ত সুন্নী উলামায় কিরামগনের ফাতাওয়া যে, গরু ও মহিষ ইত্যাদি পশুর উযড়ী খাওয়া মাকরূহ তাহরিমী। এই বিষয়ে সুন্নীদের সতন্ত্র বই পুস্তক রহিয়াছে। আলাউদ্দীন জিহাদী এই মসলার বিরোধীতা করতঃ উযড়ী খাওয়া জায়েজ বলিয়া ফাতাওয়া দিয়াছে।

আলাউদ্দীন জিহাদী সুন্নী হইবে কেন? যদি সে আসল সুন্নী হইত, তাহা হইলে বাংলাদেশের স্বনামধন্য বুযুর্গ ও আলিমে দ্বীন এবং বহু পুস্তকের লেখক হজরত আল্লামা আব্দুল করীম সিরাজনগরী সাহেব কিবলা হাজার হাজার মানুষের সামনে সুন্নী ষ্টেজ থেকে তাহাকে নামাইয়া দিতেন না। কিন্তু বড় আফসোস ও দুঃখের বিষয় যে, জিহাদীকে সুন্নী উলামায় কিরাম চুন্নী বলিয়া ষ্টেজ থেকে নামাইয়া দিতে দ্বিধা করিতেছেন না, সেখানে ভারতের মুর্শিদাবাদ এবং করিমগঞ্জের একদল মৌলবী তাহাকে চিয়ারে বসাইয়া এবং নিজেরা পায়ের কাছে বসিয়া আবার কেহ পিছনে দাঁড়াইয়া গায়ে হাওয়া করিতেছে। আর জিহাদীর জবান থেকে মাসলাকে আ'লা হজরত বিরোধী বক্তব্য শুনিতেছে। নাউজুবিল্লাহ! লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আলা উদ্দিন জিহাদি বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শ্রীমঙ্গল গাউসিয়া শফিকিয়া মাদ্রাসার ছাত্র। তারপর তিনি সম্ভবত সোনাকান্দা মাদ্রাসা থেকে কামিল মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন। তিনি ইতিপূর্বে বাংলাদেশে পরিচিত ছিলেন না। কয়েক বছর ধরে তিনি বেশ আলোচিত বক্তা হিসেবে বাংলাদেশে সুপরিচিত। তিনি ফরিদপুর আটরশি দরবারের মুরিদ; নিজেকে দরবারে আটরশির খাদেম হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকেন। উক্ত দরবার সৈয়দ আহমদ রায় বেরেলবী সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত।

উল্লেখ্য যে আলা উদ্দিন জিহাদি বালাকোটিদের মুরিদ হলেও তিনি মসলকে আলা হযরতের গুনগান করে সাধারণ মানুষকে ধোকা দিছে।

জানিয়া রাখিবেন! যে সমস্ত মৌলবীরা জিহাদীর ষ্টেজে বসিয়া তাহার বক্তব্য নিরবে শুনিয়াছে, তাহারা প্রত্যেকেই হইলেন সুন্নীদের কলঙ্ক। কারণ, এই মৌলবীর দল এতদিন পর্যন্ত মসজিদের বাহিরে আজান, কবরে আজান ও উযড়ী খাওয়া মাকরূহ তাহরিমী ইত্যাদি বলিয়া ষ্টেজ কাঁপাইয়াছে এবং চ্যালেঞ্জের পর চ্যালেঞ্জ দিয়া বেড়াইয়াছে। ইহারা এখন কি করিবে? ইহাদের মুখ দিয়া মাসলাকে আ'লা হজরত জিন্দাবাদ বলা মানান সই হইবে? ইহারা কোন লজ্জায় আগামী দিনে মসজিদের বাহিরে আজানের জন্য বাহাস করিতে যাইবে? সুন্নীয়াতের খাতিরে এই মৌলবীদের উচিত, অবিলম্বে দলীলের ভিত্তিতে জিহাদীকে দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়া।

- খাজা গরীব নওয়াজ

মহম্মদ মেহেদী হাসান জামালী

সারা ভারতেরই তুমি রাজা খাজা গরীব নওয়াজ
তুমি মুনিব মোরা তোমার প্রজা খাজা গরীব নওয়াজ।।

কুতুব ফরিদ নিজাম সিরাজ আলাউল নূর ও সিমনানি
মহীরুহ তোমার এক একটা শাখা খাজা গরীব নওয়াজ।।

দোয়া মকবুলের জায়গা ও খাজা তোমার নূরী দরগা,
দিল শিক্ষা ইমাম আহামদ রাযা খাজা গরীব নওয়াজ।।

আনা সাগর এলো এক পিয়ালায় তোমার হুকুমে,
খোদা দিল তোমায় এমন মর্যাদা খাজা গরীব নওয়াজ।।

যে দিন হতে মাথায় নিলে কদম গউসুল আযমের,
মাথায় নেয় তোমার কদম আউলিয়া খাজা গরীব নওয়াজ।।

হাসান হুসাইন বাগানের ফুল তুমি তো আওলাদে রাসুল,
আতায়ে কিবরিয়া ও মুস্তাফা খাজা গরীব নওয়াজ।।

ভালোবাসা ও প্রেম দিয়ে সারা ভারত জিতে নিলে,
আজও উড়ে তোমার বিজয় ধ্বজা খাজা গরীব নওয়াজ।।

তোমার দরবার থেকে পৌঁছে দাও বাগদাদ সোনার মদিনায়,
কবুল করো আমার এই ইলতিজা খাজা গরীব নওয়াজ।।

প্রিয় নবীর নায়েব তুমি খাজায়ে হিন্দাল ওলি,
ভারতে নূর নবীর উজ্জ্বল মোজেজা খাজা গরীব নওয়াজ।।

তোমার দর্শনসুধা দিয়ে বাঁচাও মোর মৃত হৃদয়কে,
সরাও হাসানের চোখের পর্দা খাজা গরীব নওয়াজ।।

--- ---

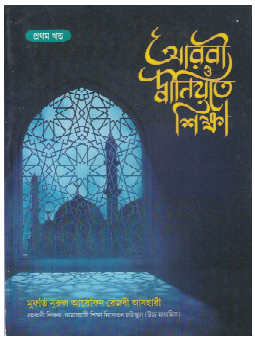

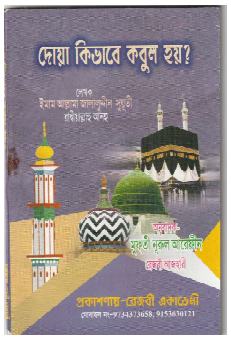

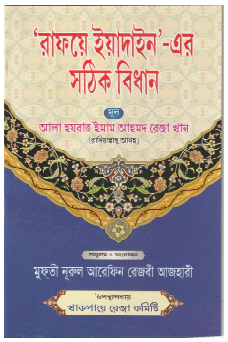

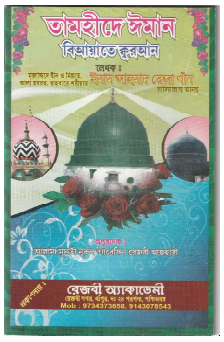

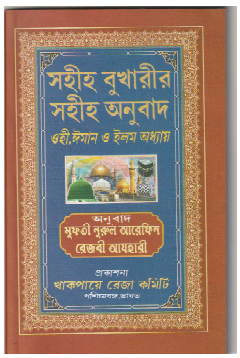

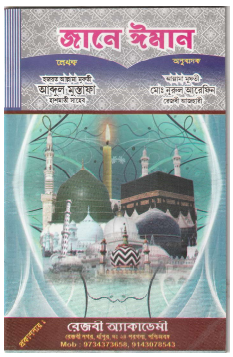

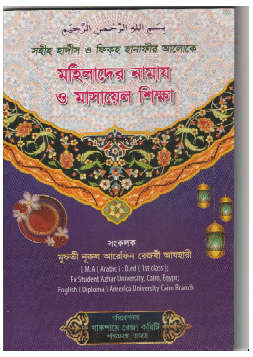

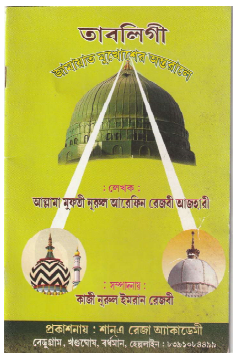

Ashrafiya Net Center

Prop - Khairul hasan asraf
Cont - 9775195662/7001258669
ashrafiyanetcenter@gmail.com

বাংলা, ইংরেজি, উর্দু ও আরবী ভাষায় প্রশ্নপত্র, বই টাইপ ও সেটিং করা হয়।

ফিকরে রেজা অ্যাকাডেমি
(ইসলামিক পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয় সেন্টার)
বিঃ দ্রঃ - মুফতি নুরুল আরেফিন রেজবী আযহারী সাহেবের লিখিত সমস্ত বইগুলি পাওয়া যায়।

Fatekhar Jangal, Lutbagan @ Jangipur @ Murshidabad